৩৬ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১৬

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাঙালি মননে বিজ্ঞান চেতনা	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	৩
গণ্ডাছড়ায় জ্যান্ত মা কালী	সুদীপ নাথ	৯
বিস্কুট বনাম ইউরিয়া-মুড়ি	গৌতম মিস্ত্রি	১২
বিশ্বাসে মিলায় বদ্যি	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১৭
শিক্ষা কিনবেন বাবু	সুদেষ্ণা ঘোষ	২০
দুঃখ যখন উৎসবের আসনে	ষড়ানন পণ্ডা	২৩
বন্ধ চা-বাগান	সুদীপ চক্রবর্তী	২৫
নাটক প্রাতঃকৃত্য	বরুণ ভট্টাচার্য	২৬
পদবী পরিক্রমা	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
অতীন্দ্রীয় গল্প বাদ দিয়ে	পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়	২৮
চিঠিপত্র		২৯
গ্রন্থ সমালোচনা		৩১
সংগঠন সংবাদ		৩২

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬
ফোন ঃ ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৮৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট ঃ www.utsamanush.com
ই-মেল ঃ utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

অদ্ভুত আঁধার এক...

এক সময় স্কুলে নীতিগল্প পড়ানো হত। তারই একটি গল্প হল 'নেকড়ে আর ভেড়ার গল্প'। পাহাড়ি ঝর্নায় একটা বাচ্ছা ভেড়া জল খাচ্ছিল। তার বেশ ওপরে জল খাচ্ছিল এক নেকড়ে। হঠাৎ তার ভেড়ার ছানাকে দেখে খাবার লোভ হল। নিচে নেমে এসে তাকে বলল, তোর যে ভারি সাহস, আমার খাবার জল ঘোলা করে দিচ্ছিস। বিস্মিত ভেড়া জানায়, তা কী করে হয়, আপনি তো ওপরে ছিলেন। উল্টে আপনি আমার জল ঘোলা করতে পারেন। নেকড়ে প্রসঙ্গ পাল্টে জানায়, তুই আমাকে দু বছর আগে গালিগালাজ করেছিলি। ভেড়ার ছানা জানায়, দু বছর আগে তো আমার জন্মই হয় নি। তাহলে তুই নয় তোর বাবা গালাগাল দিয়েছিল, এই বলে ভেড়াটিকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে। গল্পের শেষে নীতিবাক্য ছিলঃ 'দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।' ছত্তিশগড়ের দল্লির শহিদ হাসপাতালের চিকিৎসক শৈবাল জানাকে গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গে গল্পটা মনে পড়ল। ১৯৯২ সালের এক তামাদি মামলায় সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। ভিলাই শিল্পাঞ্চলে ১ জুলাই ১৯৯২ পুলিস আন্দোলনকারী খনিশ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। মারা যান ১৮ জন। শ্রমিকনেতা শঙ্কর গুহনিয়োগীর গড়া ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার বহু সদস্য আহত হন। শৈবালের অপরাধ, তিনি তখন আহতদের চিকিৎসা করেছিলেন। শঙ্কর গুহনিয়োগী শ্রমিকদের অর্থে তাঁদের জন্য এক হাসপাতাল গড়ে তুলেছিলেন, যার নাম শহিদ হাসপাতাল। আমাদের জানা ডাক্তাররা যখন নানান ধান্দাবাজিতে নিবিষ্ট, তখন এই শৈবাল জানা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে যোগ দেন সেখানে। না, দু দিন শখের সমাজসেবা করে কিঞ্চিৎ নামডাক হতে শটকে পড়েন নি। দিনরাত এক করে তিলে তিলে হাসপাতালটিকে আরও উন্নত করে তুলেছেন। ওঁর সহযোদ্ধা বিনায়ক সেন জানিয়েছেন, শৈবাল ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হলেও, অস্থিশল্য চিকিৎসাতেও কম যেতেন না। হাড়ের জটিল অস্ত্রোপচার করতে পারতেন, আর যে কোনো মেডিসিনেই তাঁর দখল ছিল ঈর্ষণীয়। উল্লেখ্য, এই বিনায়ককেও ২০০৭

সালে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এই সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছিল ছত্তিশগড়ের পুলিশ। এখন এই রাজ্যে বিজেপি সরকার। এরা আবার কংগ্রেসের এককাঠি বাড়া। অপদার্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি হাসপাতালের নাকের ডগায় সমান্তরালভাবে শহিদ হাসপাতাল চালানোটাকে মোটেই তারা সুনজরে দেখে না। বিশেষত যেখানে গরিব মানুষগুলো প্রায় বিনা পয়সায় সুচিকিৎসা পাচ্ছে। অতএব দেখাচ্ছি মজা বলে নখদাঁত বের করে ফেলেছে। এটা শুধু ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রেই ঘটছে এমন নয় বিজেপি-র প্রত্যক্ষ মদতে বজরং, শিবসেনা, বাহুবলী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ লগুড় হাতে রে রে করে বেরিয়ে পড়েছে, কেউ গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তা, শ্রমিকের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে কথা বললেই তাঁদের মাথায় বসিয়ে দিচ্ছে দু ঘা। না হলে পুলিশ তো রয়েছেই। মাওবাদী তকমা দিয়ে জেলে পুরতে কতক্ষণ! সেই জন্যই কবর খুঁড়ে ৯২ সালের মামলা বের করেছে। পুলিশের হাস্যকর যুক্তি, শৈবাল ফেরার ছিলেন, তাই ধরা যায় নি। অথচ এই দীর্ঘ ২৪ বছর শৈবাল দল্লি ছেড়ে কোথাও যান নি। প্রায় ২৪ ঘণ্টাই হাসপাতালে চিকিৎসা করে কাটিয়েছেন। জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী আলপনা। সুখের কথা শৈবালের বিরুদ্ধে রমন সরকারের এই প্রতিহিংসামূলক আচরণের প্রতিবাদ উঠেছে দেশ জুড়ে।

শুধু শৈবাল নন, এরকম কোপে পড়ছেন অনেকেই। ঘটনাচক্রে শৈবাল গ্রেপ্তার হওয়ার মাসখানেক আগেই ২০ ফেব্রুয়ারি সোনি সোরির ওপর অ্যাসিড হামলা হয়েছে। জগদলপুর লিগাল এইড গ্রুপের (জগলগ) দুই আইনজীবী শালিনী গেরাও ইশা খাণ্ডেলওয়ালকে জগদলপুর থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছে পুলিশ। ওঁরা যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়ির বাড়িওয়ালাকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখায় পুলিশ। বলে ঘর খালি করে দিতে। কারণ এই জগলগ ২০১৩ থেকেই বস্তার অঞ্চলে আদিবাসী বন্দীদের আইনি সাহায্য দিচ্ছিল। শালিনী ও ইশার বিরুদ্ধে মাওবাদী যোগে অভিযোগ এনেছে পুলিশ। স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশন চাপ দিয়ে ওঁরা যাতে মামলা লড়তে না পারেন, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তবে রাজ্য বার কাউন্সিল অবশ্য এই চক্রান্ত ভেস্তে দেয়।

বেলা ভাটিয়া একজন গবেষক। বস্তারেই থাকেন। সোনি সোরি এবং জগলগের সঙ্গে বেলাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলী নথিবদ্ধ করেন এবং তা নিয়ে মামলা করেন। পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী কীভাবে পরিকল্পিত হিংসা চালায় সে নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করেন। বেলাকেও পুলিশ ডেকে হুমকি দিয়েছে। বাড়িওয়ালাকে বলে দিয়েছে উৎখাত করে দিতে। সালওয়া জুডুমের প্রাক্তন সদস্যরা এখন সামাজিক একতা মঞ্চ বা নকশাল পীড়িত সঙ্ঘর্ষ সমিতি নাম নিয়ে সক্রিয়। ওরাও বেলাকে হুমকি দিয়েছে।

মালিনী সুব্রহ্মণ্যম পেশায় সাংবাদিক। ছত্তিশগড়ের নানা ঘটনা তুলে ধরেন। যার মধ্যে রয়েছে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, মহিলা ও শিশু, নিরা পত্তা বাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচার, ভুয়ো সঙ্ঘর্ষ ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদি। মালিনী বাড়িতে যে পরিচারকের কাজ করতে পুলিশ তাকে থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে সারারাত আটকে রাখে মালিনীকে সন্ত্রস্ত করতে। তাঁর ওপরেই মাওবাদী তকমা লাগিয়ে দিয়েছে পুলিশ। যাঁরা মালিনীর পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই মালিনী বাধ্যত জগদলপুর ছেড়েছেন গত ১৯ ফেব্রুয়ারি।

আরেক সুখবর, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে এন সাইবাবাকে সুপ্রিম কোরট জামিন দিয়েছে। মাওবাদী যোগ আছে, অভিযোগ তুলে মহারাষ্ট্র সরকার ওঁর জামিনের বিরোধিতা করেছিল।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

বাঙালী মননে বিজ্ঞান চেতনা

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। অশোক তার স্বল্পজীবনের বেশিরভাগ সময়টা যেভাবে ব্যবহার করেছে, নিজেকে নিংড়ে দিয়েছে সেটা মনে করে... ঠিক বোঝাতে পারছি না... এই আবেগ না সামলালেই ভালো হত... তার উপর আমার অপরিসীম শ্রদ্ধাতেই এই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসা... সামলে নিতেই হবে, নইলে বলব কী করে!

বাঙালী মননে বিজ্ঞান চেতনা বিষয়টা অনেক বড়। আমি এর যোগ্য ততটা নই। আরও বেশি অস্বস্তিতে পড়েছি সামনে শ্রোতাদের দেখে। যাঁদের বইপত্র পড়েটড়ে আমি একটা বিশ্বাসে এসে পৌঁছেছি, তাঁদের অনেকেই এখন আমার সামনে বসে আছেন।

মূল বিষয়ে যাবার আগে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা কিছুটা বলি। আকাশবাণীতে আমি ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকরি করতে আসি। এর আগে থেকেই উৎস মানুষ পত্রিকাটি মাঝে মাঝে পড়তাম। এবং ১৯৭৫-৭৬ থেকেই আমি গল্পটল্প লিখতাম। আমি যে ধরনের গল্প প্রথম থেকেই লিখতাম, সেটা শুধুমাত্র প্লট বা ঘটনানির্ভর ছিল না। সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব থাকে, প্রতিকূলতা, বাধা-বিপত্তি থাকে, এবং সেই সব দ্বন্দ্বের ফল বা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কতগুলো ইনসিডেন্ট বা ঘটনা উঠে আসে, সেই সামাজিক ঘটনাগুলির ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করতাম, সামাজিক প্রোডাক্ট হিসেবে কিছু চরিত্র তৈরি হত। সেই সব চরিত্ররাই আমার গল্পের চালিকাশক্তি। যেমন জমির দালাল, কোয়াক ডাক্তার, আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষ, সাপে-কাটা মানুষ, কিম্বা তোলাবাজ। উৎস মানুষ পত্রিকাতেও এইসব বিষয়েরই প্রতিফলন দেখতাম। Science today জাতীয় বিজ্ঞান পত্রিকা ছিল না উৎস মানুষ। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য জানাবার পত্রিকাও নয়। নানা রকম সামাজিক সমস্যা, যার সঙ্গে রাজনীতি ও ইতিহাস জড়িত, সে সব থাকত, যেমন চেরনোবিলের তেজস্ক্রিয় প্ল্যান্টের দুর্ঘটনা, আরোয়ালে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অত্যাচার, রঙ করা খাবার, ওষুধ নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা এবং সেই সঙ্গে বাঙালি জীবনের নানারকম কুসংস্কার, যা সমাজের গতিকে ব্যাহত করে।

১৯৭৫ সালে, সম্ভবত, আকাশবাণীতে science cell তৈরি হয়। উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই সায়েন্স সেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বলা যায় বিজ্ঞান প্রচারের একটা মডেল তৈরি করেছিলেন। সঙ্গে অমিত চক্রবর্তীও ছিলেন। সেই মডেলটার এখনও খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। আমি ১৯৯২ সাল থেকে ২০০২ আবার ২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সায়েন্স সেলে যুক্ত ছিলাম। মূলত ওঁর মডেলটাই অনুসরণ করেছি। এখন ডঃ মানসপ্রতিম দাস আছেন, ওই

মডেলটাই অনুসরণ করছেন। সরকারি প্রচারমাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের একটা সমস্যা আছে। কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে রেডিওতে সরাসরি কিছু বলা যায় না। প্রতারক জ্যোতিষী বা অলৌকিক বাবাদের নাম ধরে কিছু বলা যায় না। সবদিক বাঁচিয়েই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করতে হয়। অথচ কে না জানে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মচর্চার সঙ্গে সম্পর্কটা সুবিধার নয়। নানাবিধ কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই জারি রাখতে হয়। কুসংস্কার হল এমন কিছু বিশ্বাসজনিত অভ্যাস, যা কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে। যার মধ্যে যুক্তির অভাব। এবং বিজ্ঞান যুক্তিহীনতাকে অগ্রাহ্য করে। এ নিয়ে নতুন করে কী বলব। যে শ্রোতৃমণ্ডলী এখানে উপস্থিত, তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। কিন্তু একটা জিনিস আপনারা সবাই লক্ষ্য করেছেন যে, প্রাচীনতার স্বপক্ষে, যুক্তিহীনতার স্বপক্ষে যুক্তিবিস্তার করার একটা চেষ্টা থেকেই যায়। লড়াইটা সেখানেই। ট্রেনে দেখেছি হকাররা চটি বই বিক্রি করেন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। ওখানে বলা আছে, আলতা হল হাজানিবারক। মেয়েদের পায়ে জলহাজা হয়, আলতা সেটা প্রতিরোধ করে। সিঁদুর অ্যান্টিসেপ্টিক। তুলসীপাতাও অ্যান্টিসেপ্টিক। গ্রহণ লাগলে খেতে নেই, কারণ সূর্যালোকের অভাবে জীবাণুবৃদ্ধি হয়। তাই খেতে নেই। এরকম অনেক যুক্তি। এগুলো চটি বই। কিন্তু একটা থিসিস পেপারের কথা জানি, যেটা বাঙালির সংস্কার-কুসংস্কার সম্পর্কিত। তাঁর মুদ্রিত বইটিতে দেখেছি এক জায়গায় উনি বলতে চেয়েছেন, যে সংস্কারগুলি আজ যুক্তিহীন মনে হচ্ছে, এক সময় তা যুক্তিপূর্ণ ছিল। যেমন রাতে শাক খেতে নেই। কারণ তখন বিদ্যুতের আলো ছিল না, শাক ভালো করে বাছা সম্ভব ছিল না, তাই শাক খাওয়া বারণ ছিল। একই যুক্তিতে দোকান থেকে রাতে সূচ বিক্রি হত না। অন্ধকারে সূচের মতো সূক্ষ্ম জিনিস পড়ে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু সংস্কার আজও প্রাসঙ্গিক। যেমন, ত্রয়োদশী তিথিতে বেগুন খেতে নেই। ওঁর যুক্তি-- ত্রয়োদশী তিথিতে বেগুন সূর্যের কোনও খারাপ তরঙ্গ শোষণ করে। তিনি আরও বলেছেন, লোকসংস্কার সেটা 'সু' হোক বা 'কু' হোক, তা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। লোকসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওদের সংস্কারগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কোনও কোনও আদিবাসী সমাজে ডাইনি কাল্ট প্রবল। ওরা ডাইনি সাব্যস্ত করে হত্যাও করে। একজন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃস্থানীয় মানুষ আমাকে বলেছিলেন, এটা আমাদের পরম্পরা। জোর করে ডাইনিতন্ত্র ধ্বংস করা উচিত নয়।

আসলে এগুলো সব হল সামন্ততন্ত্রের অবশেষ। সামন্ততন্ত্রে শর্তহীনভাবে ভূস্বামীদের কাছে সমর্পিত হবার অভ্যাস থাকে। কৃষিকেন্দ্রিক এই উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃতির ক্রীড়নক। প্রকৃতির উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে প্রকৃতিকে নিয়ে নানা ভয় থেকে যায়। রোদবৃষ্টি নিয়ে, উর্বরতা নিয়ে, অসুখ-বিসুখ নিয়ে যুক্তিহীন ধারণা তৈরি হয়। এবং এই ধারণাগুলি সমস্ত শোষণ টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। গ্রামে পাপ হয়েছে, বৃষ্টিদেবতা বা ফেরেস্তা খুশি হয় নি তাই খরা হয়েছে, এই বিশ্বাসে স্থিত রাখা গেলে ভূস্বামী/জমিদার/সরকারের কাছে বেকল্প সেচ ব্যবস্থার দাবিই উঠবে না। আমাদের দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করেছে এক-দেড়শো বছর আগে থেকেই। তবে ওরা কি ধরনের বুর্জোয়া এসব জানি না। কতটা কম্প্রোডার বুর্জোয়া, কতটা ন্যাশানাল বুর্জোয়া এসব সূক্ষ তর্ক বাদ দিয়েই বলা যায়, সামন্তবাদী চিন্তাগুলো আমাদের মধ্যে অনেকটাই রয়ে গেছে। তার মানে এই নয় যে, বুর্জোয়া সমাজে কুসংস্কার থাকে না। সেটাও থাকে, চরিত্র একটু আলাদা। যেটা বলছিলাম, নকশালপন্থী আন্দোলনে একটা শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন ছিল। ব্যর্থ হল। কিন্তু স্বপ্নরা জামা পাল্টে, পোশাক পাল্টে হাজির হয়েছিল বেশ কিছু তরুণ-মনে। সমাজ বদল তখন হল না, কী করা যাবে, তাই বলে চুপচাপ বসে বসে টুকটাক গেরস্ত জীবনযাপন? তাঁরা তা করেন নি। এক ঝাঁক তরুণ স্বাস্থ্য আন্দোলন করলেন, বিজ্ঞান আন্দোলন করলেন, বিজ্ঞানের পত্রিকা বার করলেন। উৎস মানুষ সেই মানসিকতারই ফসল। এর আগে যে আদৌ বিজ্ঞান পত্রিকা ছিল না, এমন নয়। উৎস মানুষের বিশেষত্ব কী এ নিয়ে আগেই কথা হয়েছে। শহর থেকে গ্রামে কাজ করতে গিয়ে ওঁরা দেখেছিলেন কতগুলো সংস্কার মনুষ্যত্বকে অপমান করে। এর মধ্যে প্রধান হল জাতিভেদ প্রথা। বর্ণগত জাতিভেদ ছাড়াও ক্ষমতাগত জাতিভেদ আছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্তরা উচ্চ জাতি। একজন গ্রামপ্রধান, তিনি যে বর্ণেরই হোক, একজন ভ্যানওলাকে তুই তোকারি করতে পারে। আর বর্ণভেদ তো আছেই। এই অযৌক্তিক অভ্যাসগুলির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা দরকার মনে করেছিল ওরা। এই আন্দোলনের উৎসে ছিল 'উৎস মানুষ'।

বিজ্ঞান আন্দোলনেও অনেক গোঁড়ামি (ডগমা) থাকে। আমি এক বিজ্ঞানকর্মীকে জানতাম, যিনি নতুন বাড়ি করেছেন, গৃহপ্রবেশ করবেন, সবচেয়ে খারাপ দিনটা বাছলেন। যেদিন যখন যাত্রা নাস্তি, কালবেলা, ত্র্যহস্পর্শ, সব কিছু খারাপ খারাপ আছে, সেইসব দেখে গৃহপ্রবেশ করলেন। সেই তো পঞ্জিকা দেখতেই হল। যদি সুবিধা মতো দিনে ঢুকে যেতেন, তা হলেই হত। পঞ্জিকা মতে ওটা শুভযোগ বা অশুভযোগ যাই হোক না কেন? একজন বিজ্ঞানকর্মী বিবাহ করলেন। বিয়ের চিঠির উপরে সূর্যগ্রহণের ছবি। এবং বিয়েটা হল মল মাসে, যে মাসে বিয়ের তারিখ হয় না। এগুলোও যেন এক ধরনের বিজ্ঞানমনস্কতার কুসংস্কার। উৎস মানুষের এসব ছিল না। ওরা প্লাস্টিকের ভালোমন্দ ছেপেছে। প্লাস্টিকের খারাপ দিকটাই সবসময় বলা হয়। কিন্তু প্লাস্টিকের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে খারাপ দিকগুলো বর্জন করতে বলাটাই যুক্তিযুক্ত। এটাই বিজ্ঞান। এটাই সত্যিকারের বিজ্ঞান মানসিকতা। বাঙালি মননে এই র‍্যাশনালিজম-এর অভাব। হয় ভালো, নয় মন্দ এভাবেই দেখার অভ্যেস। হয় কালো নয় সাদা। একটা আপ্তবাক্য আছে, সাধারণ বাঙালি এটা খুব আউড়ে থাকে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। অমর্ত্য সেন যতই তার্কিক বাঙালির জয়গান করুন না কেন, বাঙালি বিশ্বাসপ্রবণ। নাস্তিকতাও একটা বিশ্বাস। যাঁরা ঘোর নাস্তিক, তাঁরাও 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' গোত্রের। বিজ্ঞানকর্মীরা বলেন সাপে কাটলে কখনও ওঝাদের কাছে যাবেন না। বেতারের অনুষ্ঠানে আমরাও বলেছি এ কথা। একবার একটা চিঠি পেলাম, একজন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লিখেছেন আপনারা প্রচার করছেন ওঝাদের কাছে না গিয়ে সাপেকাটা রোগীকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমরা তাই করেছি। ভ্যানে করে ৮ কিলোমিটার দূরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলাম, ওখানে অ্যান্টিভেনিন নেই, তারপর আরও দূরের বাগুড়িয়া নিয়ে যেতে যেতে পথেই রোগী মারা গেল। ওঝাদের কাছে গেলে যা হোক কিছু একটা ওঁরা করতেন। বিনা চিকিৎসায় আমার দাদার মরণ হত না। এই মৃত্যুর জন্য আপনাদেরই দায়ী করব। সঙ্কটটা দেখুন। প্রতিটি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যান্টিভেনিন বা সাপেকাটার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখার আন্দোলনটা আগে দরকার, তারপর ওঝা-বিরোধিতা। অশোকের একটা স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, ওঝাদের একেবারে হেলাফেলা না করে ওদের সাপেকাটার প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়াটা জরুরি, কারণ ওঁরা সাপ ব্যাপারটা বোঝেন। গত বামফ্রন্ট আমলে একটা চেষ্টা হয়েছিল গ্রামের মানুষদের জন্য তিন বছরের একটা ডাক্তারি কোর্স চালু করার। বড় ডাক্তারদের বিরোধিতায় ওই প্রচেষ্টা কার্যকর হয় নি। ওঁদের বক্তব্য ছিল, এতে গ্রামীণ মানুষদের অপমান করা হচ্ছে। শহরের জন্য পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ, আর গ্রামের জন্য তিন বছরের, এটা অনৈতিক। কিন্তু তর্কের খাতিরে অনৈতিক মনে হলেও এটা বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা ছিল। চীনে খলিপায়ের ডাক্তারের একটা কনসেপশন ছিল। এবং এতে গ্রামে গ্রামে একটা ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। অশোকের এই বাস্তব জ্ঞানটা ছিল। জ্যোতিষীরা ঠগ এবং প্রতারক, সরাসরি এই প্রচার না করে অশোকের পরিকল্পনা মতো রেডিওতে একটা অভিনব অনুষ্ঠান করা হয়েছিল ১৯৮২ বা ৮৩ সালে। আমাদের চারজন সহকর্মীর জন্মছক চারজন বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দেওয়া হয়েছিল এবং ১০-১২টা প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। চারজন জ্যোতিষীর রেকর্ডিং রাখা হয়েছিল আলাদা আলাদা দিনে। কেউ জানত না এই ব্যাপারটা। প্রত্যেকেই ওই ১০-১২টা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। পরে ওই চারটে ভূত-ভবিষ্যৎ সমন্বিত প্রশ্নোত্তর একসঙ্গে করা হল এবং দেখা গেল উত্তরগুলির কোনও সামঞ্জস্য নেই। তারপর যে চারজনের জন্মছক দেওয়া হয়েছিল, সেই চারজন নিজেদের কথা বললেন। আমরা কোনও মন্তব্য করি নি। শুধু বলেছিলাম, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পৃথক হয় না। যে ল্যাবরেটরিতেই কোনও যৌগ বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, উত্তর একই হবে। শ্রেতারা নিজেদের মতো করে বুঝে নিতে পেরেছিলেন। যাঁরা 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'-তে অনড় বিশ্বাসী, তাঁদের কথা আলাদা। ওঁরা একটা কথা বলেন, বিজ্ঞান যেখানে শেষ, আধ্যাত্মিকতা এরপর থেকে শুরু। বিজ্ঞান পৃথিবীর সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে না। ঈশ্বর বা কোনও এক অলৌকিক শক্তি বা কোনও এক সর্বজ্ঞ এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। 'বিজ্ঞান' শব্দটাকে শুধু গত শতাব্দী কেন, এই সময়েও অনেকে ভুল বোঝেন। ভাবেন বিজ্ঞান মানে যন্ত্রপাতি, নাটবল্টু, চিপ্‌স, সার্কিট। অনেক আগে বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বিজ্ঞান শব্দটাকে একটা আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার করতেন। নির্বাণ সম্পর্কিত জ্ঞানের একটা স্তরকে বিজ্ঞান বলা হত, বিশেষ জ্ঞান অর্থে। সায়েন্স বোঝাতে বাংলায় বিজ্ঞান শব্দটার ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম

করলেন ১৮৭৫-এ। এর আগে ১৮৫৫ সালে একটি গ্রন্থের নাম দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান সাধুরঞ্জন। লেখক রসিকচন্দ্র রায়। এটি ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে একটি মোটা দাগের কাব্যগ্রন্থ।

বিজ্ঞানের চর্চা এ দেশে ইয়োরোপীয়রাই শুরু করেছিলেন। বাংলা বইতে বিদ্যা শব্দটি ব্যবহার হত। যেমন পতঙ্গবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা। ১৮৩১ সালে একটি সাময়িক পত্রিকা বেরিয়েছিল– জ্ঞানান্বেষণ। এতে বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধ কিছু কিছু থাকত। এতে বায়ু, বিদ্যুৎ, আলো সম্পর্কিত নিবন্ধও দেখা গেছে। বাংলায় বস্তুগত জ্ঞান অর্থে বিজ্ঞান শব্দটাকে জনপ্রিয় করলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। 'বিজ্ঞান কৌতুক' নাম দিয়ে বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। অনেকগুলো প্রবন্ধই লিখেছিলেন তিনি। ১৮৭৫ সালে 'বিজ্ঞানরহস্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান শব্দটাকে বস্তুতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান মনে করতেন। এখন বিজ্ঞান শব্দটা আমাদের মনে যে অনুভূতি দেয় সেটা হল 'খোঁজ' বা অন্বেষণ, কার্যকারণ সম্পর্ক খোঁজা, আরও সোজাভাবে বলতে গেলে যুক্তিনিষ্ঠ হওয়া। বিধবা হলে চুল ফেলে সাদা থান পরে থাকার মধ্যে যুক্তি খুঁজে না পাওয়া কিম্বা জাঙ্ক ফুড না খাওয়ার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাওয়া কিম্বা গরমকালে সাদা পোশাক পরা, কিম্বা শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানো-- এগুলো সবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এগুলি বিজ্ঞানসম্মত। এবং এগুলি অর্জিত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। বৃষ্টি কেন হয়, এই জ্ঞান যখন মানুষের আয়ত্তে আসে, তখন খরার সময় বৃষ্টি আনার যজ্ঞ অযৌক্তিক মনে হয়। খরার একটা কারণ যে বনানী ধ্বংস– এটা যখন মানুষ জানতে পারে, তখন বনসৃজনে তৎপর হয়।

নতুন নতুন জ্ঞান, যা বন্ধ দরজাগুলি খুলে দেয়, এই ক্রমপ্রসারিত জ্ঞান অনেক সময় ধর্মবিরোধী হয়। ধর্মীয় বইগুলিকে ভাবা হয় অকাট্য, অপরিবর্তনীয়। কোনও কোনও ধর্মপুস্তককে ভাবা হয় ঈশ্বরপ্রেরিত। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের একটা ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব থেকেই যায়।

ধর্ম ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি আছে। অভিধান যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যেও বিভ্রান্তি ছিল, নইলে ধর্ম অর্থে এতগুলি কথা কেন?

ধর্ম অর্থে আশুতোষ দেবের অভিধান বলছে-- শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার, বেদ-বিহিত অনুষ্ঠান, সুকৃত, পুণ্য, রীতি, কর্তব্য, ভাব, স্বাভাবিক অবস্থা, গুণ, অলৌকিক পদার্থ বিষয়ক বিশ্বাস ও উপাসনা প্রণালী, উচিত কর্ম, অবশ্যকর্তব্য কর্ম, ষড়বিধ পুণ্য কার্য যথা– যোগ্য পাত্রে দান, কৃষ্ণে মতি, মাতাপিতার সেবা, শ্রদ্ধা, গরুকে আহার্য দান। যম।

দেখুন, কী কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা! ষাঁড়কেও ধর্ম বলা হয়, এখানে যদিও উল্লেখ নেই। মহাভারতে বকরূপী ধর্মের উল্লেখ আছে। কেউ যদি বলেন, আপনি কি ধর্ম মানেন? বুঝতে হবে, জানতে চাওয়া হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা। ধর্ম আর ঈশ্বর অনেকের কাছে সমার্থক। আমার তা মনে হয় না। বাংলায় ধর্ম শব্দটার ব্যঞ্জনা এত ব্যাপক যে এর মধ্যে ঈশ্বর সংক্রান্ত চিন্তা ছাড়াও আরও অনেক কিছুর ঠাঁই হয়। আমরা পদার্থের গুণ নিয়ে কথা বলতে গেলে 'ধর্ম' শব্দটাই ব্যবহার করি যেমন অক্সিজেনের ধর্ম, জলের ধর্ম। জীবজগতের ধর্ম, মানুষের ধর্ম নিয়ে কথা বলার সময় মানুষের অভ্যাসের কথাই বলি। আবার 'ধর্মে সইবে না' বলার মধ্যে অনৈতিক কাজ বা সমাজের পক্ষে অমঙ্গল এমন কাজে উৎসাহ না দেওয়ার কথাই বলা হয়। ইংরিজিতে যেটা Religion, এর মধ্যেও ঈশ্বরবোধ ওতপ্রোত নাও থাকতে পারে। ঈশ্বর ছাড়াও ধর্ম হয়, যেমন বৌদ্ধধর্ম। তবে Religion বলতে যা বোঝায়, আমরা ধর্ম বলতে তাই মনে করব। Religion মানে একটি নির্দিষ্ট ঈশ্বরবোধ এবং আদিষ্ট জীবনচর্যা। কোরান বাইবেল এগুলোকে আসমানি কিতাব ভাবা হয়, এগুলো ঈশ্বরের বাণী বা আদেশ বলে ভাবা হয়।

এই আসমানি কিতাবে যা লেখা থাকে, ওগুলোকে অভ্রান্ত ভাবনা থেকেই যুক্তি বুদ্ধির সঙ্ঘাতটা হতে থাকে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বা বলা যায় বিজ্ঞানের সঙ্গে এখানেই দ্বন্দ্ব এবং সঙ্ঘাত। হাইপোশিয়া থেকে ব্রুনো, গ্যালিলিও, আজকের দিনে অভিজিৎ, ওয়াশিকুর, অনন্তবিজয়, এই সঙ্ঘাতের বলি। হিন্দুদের সে অর্থে আসমানি কিতাব নেই। গোবিন্দ পানেসার কিম্বা দাভোলকারকে মরতে হয়েছে ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে। ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করে, তাদের স্বার্থ হানির কারণে।

শেষ পর্যন্ত বারবার বিজ্ঞানেরই জয় হয়েছে। এবং ধর্মব্যবসায়ীরা বিজ্ঞানকে নয়, বিজ্ঞানঘটিত কিছু শব্দবন্ধকে (জার্গন) নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করেছে। যেমন কসমিক রে, ম্যাগনেটিজম, এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, রিফ্লেক্টর, কম্পিউটার ইত্যাদি। পুরনো পঞ্জিকা খুললে

দেখতে পাই ইলেকট্রিক সল্যুশন নামে একটা জিনিস বিজ্ঞাপিত হত, যা দিয়ে দাদ হাজা থেকে অর্শ ভগন্দর সব কিছু সারিয়ে দেওয়ার দাবি করা হত। 'ইলেকট্রিক' শব্দটা পুরনো হয়ে গেলে কম্পিউটার শব্দটা এল। কম্পিউটার জ্যোতিষ। তারপর কসমিক রে। রেইকি-তে নাকি কসমিক রে দিয়ে ব্যাধি সারানো হয়! শ্রীযন্ত্রমও এইসব রে শোধন করে গৃহস্থের সুখশান্তি এনে দেয়। নানাবিধ লকেট নেগেটিভ এনার্জি রিফ্লেক্ট ব্যাক করে দেয়। পাথরটাথর নাকি নেগেটিভ এনার্জিকে তাড়িয়ে পজিটিভ এনার্জি শরীরে ঢুকিয়ে দেয়! বাস্তুবিদরা ঘরে জিওম্যাগনেটিক এনার্জি ম্যানেজ করেন। নানাবিধ জ্যোতিষ চ্যানেল বা অলৌকিক বাবাদের চ্যানেলে ওরা অদ্ভুত সব কার্যকলাপ প্রদর্শন ও বিজ্ঞাপিত করেন। একটা আইন আমাদের আছে, 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস অ্যাক্ট'। ওই আইনের প্রয়োগ নেই। নরেন্দ্র দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারেকে খুন হতে হল, কারণ ওঁরা ওই আইনের প্রয়োগ চেয়েছিলেন। বাঙালি সিভিক সোসাইটি এই প্রতারণাসর্বস্ব চ্যানেলের প্রতিবাদে সোচ্চার নয়। আজকের এই সভাতে আমরা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারি এবং আজকের মূল আহ্বান হতে পারে এইসব প্রতারণা বন্ধ হোক। চিটফান্ড যেমন প্রতারণার প্রতিষ্ঠান, এগুলোও তাই। কোটি কোটি টাকা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে নিয়ে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। যাঁরা এসব পাথর, লকেট, অমুক যন্ত্র, তমুক যন্ত্র কেনেন, ওঁরা বলেন, হতেও তো পারে, বিজ্ঞানে সব স্থির ব্যাখ্যা নেই। তন্ত্রও তো একটা পথ। বাঙালির অন্তরে গেঁথে থাকা একটা মহাপুরুষের বাণী রয়েছে– 'যত মত তত পথ'। এটা খুব মুশকিলের ব্যাপার। অর্থহীন একটা কাজ। 'যত মত তত পথ' মানতে গেলে বরুণ বিশ্বাসের পথ, আর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পথ, দুটোই সত্যি মানতে হয়। শঙ্করাচার্য এবং গৌতম বুদ্ধ দুটোই সত্যি মানতে হয়। মনু এবং আম্বেদকরের পথের তফাত করা চলে না। যদি মেনে নিই, শুধুমাত্র ধর্মসাধনার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছিল, তা হলেও মুশকিল। বাঙালির ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কতরকম মতবাদ মিশে আছে, তার ঠিক নেই। একত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, অহংবাদ, সোহংবাদ, নিরাকারবাদ, সাকারবাদ, চৈতন্যবাদ, শাক্ত, বৈষ্ণব কী নেই! একটি মতবাদের সঙ্গে অন্য মতবাদের তফাত রয়েছে। বাঙালি সব কিছু মিশিয়ে আজব একটা ধর্মবিশ্বাস তৈরি করেছে। অথবা অন্যভাবে বলা চলে কোনও 'বাদ'-এ স্থির বিশ্বাস নেই।

আচ্ছা বলুন তো, স্বর্গ-নরক যদি মানি, তা হলে জন্মান্তর কী করে মানব! মৃত্যুর পর স্বর্গ কিম্বা নরকে যদি ঠাঁই হয়েই যায়, তাহলে আবার জন্ম কীভাবে হয়! যদি মনে করি, গীতার ভাষ্য অনুযায়ী আত্মা ক্ষুধাতৃষ্ণার ঊর্ধ্বে। আত্মাকে পোড়ানো যায় না, ছিন্ন করা যায় না, বিভক্ত করা যায় না। তবে আত্মার শান্তি-অশান্তি কামনা করি কেন? শ্রাদ্ধে পিণ্ড দিই কেন? আমরা আত্মাকে পিণ্ডও খাওয়াই, আবার জন্মান্তরেও বিশ্বাস করি। আমার আত্মা যদি মৃত্যুর পর বাঘজন্ম গ্রহণ করে, সে কি চালের মণ্ড খাবে? অতশত চিন্তা করি না। যত মত তত পথ। বলির রক্তে কপালে টিপ দিই, আবার হরির লুটের বাতাসাও পাই। কালী মন্দিরের পাশে একটা মদনমোহনও থাকেন। অথচ শাক্ত ও বৈষ্ণবরা পরস্পরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ দিয়েছেন দেড়শো বছর আগেও। শঙ্করাচার্যের চেলাচামুণ্ডারা বৌদ্ধমঠ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এককালে, আজ হিন্দুধর্মে বুদ্ধও একজন অবতার।

একই ধারাবাহিকতায় একই পার্টি অফিসে গান্ধী এবং সুভাষের ছবি। কিছুই যুক্তির ধার ধারে না। খ্রিস্টধর্মের একটা নিজস্ব যুক্তি আছে। ঈশ্বর তার অংশ ট্রান্সফার করেছিলেন মেরির গর্ভে। যিশু তাই ঈশ্বরপুত্র। উনি পাপী মানুষের পাপ গ্রহণ করেছিলেন। যিশু যা যা উপদেশ দিয়েছিলেন, সে সব পালন করো। ইসলামের যুক্তি হল, ঈশ্বর তাঁর মনোনীত এক পুরুষের মাধ্যমে তাঁর বাণী পাঠিয়েছিলেন এবং কী কী করা উচিত এবং কী কী করা উচিত নয়, বলে দিয়েছিলেন। মহম্মদ হলেন শেষ নবী, মানে সেই মনোনীত ব্যক্তি। এর পর আর কোনও নবী বা রসুল আসবেন না। সুতরাং মহম্মদ যা বলেছেন, তাই তাই করো। হিন্দুদের মতো যত মত তত পথ নেই। এই বাক্যটি রামকৃষ্ণের মুখ থেকে বের হওয়ার আগে থেকেই বাঙালি এই মতে বিশ্বাসী ছিল। ফলে বাঙালির হিন্দুধর্মে এত বিচিত্র উপাদান। আমরা সব 'বাদ' বা তত্ত্ব থেকে নিয়ে একটা খিচুড়ি করেছি। যাকে ভালো কথায় বলা যায় 'সিন্থেসিস'। আমরা গ্রহণ-বর্জন করি নি। যদিও ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা ছিল এ দেশে, সেটা নিতান্তই অ্যাকাডেমিক। সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানের চর্চা ছিল না। ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫০– এই সাড়ে

পাঁচশো বছর বাংলায় যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা বা বিজ্ঞানচর্চার খরা ছিল। লৌকিক বিজ্ঞান ছিল। সুকুমার লিখেছেন, 'পুরোন পুঁথিপত্র ঘেটে আমি কিছু মশাল, তুবড়ি, হাউইবাজির মশলার কিছু ফর্মূলা পেয়েছিলাম, সেটুকুই মধ্যযুগে বাংলার বিজ্ঞানচর্চার সাক্ষ্য কিন্তু সে তো বিজ্ঞান চর্চা নয়।'

আরও কিছু পরম্পরাগত বিদ্যা জানা ছিল। যেমন মাটির ইট তৈরি। বাংলায় পাথরের অভাব, তাই ইটের মন্দির বা দালান হত। কাদাকে প্রসেসিং করে খুব শক্ত ইট তৈরি হত। টেরাকোটার মন্দিরগুলোতে যে সব কারুকার্যময় ফলক আছে, সেখানেও মাটির সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে পাথরের মতো শক্ত এবং লাল রঙের করা হত। চুন, মাটি এবং গুড়ের মিশ্রণে একধরনের উঁচুমানের সিমেন্ট তৈরি হত। নানা ফর্মুলায় কালি তৈরি হত। একটা ফর্মুলা এখানে বলিঙ্খ তিল ত্রিফলা বকুলের ছালা/ছাগদুগ্ধে করি মেলা/ তাহাতে হরিতকী ঘষি/ছিড়ে পত্র, না ছাড়ে মসি।

অ্যালকেমি চর্চার কিছুটা রেশও ছিল। 'লোহার' সম্প্রদায় লৌহ আকর থেকে লোহা তৈরি করতে পটু ছিল। এগুলো সব ছিল প্রায়োগিক বিদ্যা। গুরুমুখী বা বংশপরম্পরাগত বিদ্যা। কিছু কিছু প্রয়োগ সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল। হয়ত কারণ জানতেন না। ধরা যাক, কাসুন্দি তৈরির প্রক্রিয়া। জলকে অনেকক্ষণ ধরে ফোটাতে হয়। ১০ সের জলকে এক সের করে সরষে মেশাতে হয়। এখন আমরা জানি ১০০° সেন্টিগ্রেডে জল ফোটে, জল হল H_2O। জলের মধ্যে খুব সামান্য D_2O বা ডয়টোরিয়াম অক্সাইডও থাকে। ১০০° সে. তাপমাত্রায় D_2O বাষ্পীভূত হয় না। ফলে অনেকক্ষণ জল ফোটালে জলের মধ্যে D_2O-র পরিমাণ বেড়ে যায়, এবং D_2O ব্যাকটিরিয়াকে বাড়তে দেয় না, ফলে কাসুন্দি বেশিদিন ভালো থাকে। ডালের বড়ি দেওয়ার কতগুলি নিয়ম আছে, যাতে ডালের বড়িতে ছত্রাক সংক্রমণ না হয়। পানবরজেও কিছু নিয়ম আছে। মাছধরার বিচিত্র কৌশলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মাছের স্বভাব এবং খাদ্য সম্পর্কিত নিবিড় পর্যবেক্ষণ। নৈসর্গিক অভিজ্ঞতাগুলিকে ছন্দোবদ্ধ রূপ দেওয়া হয়েছিল। ডাকের বচন বা খনার বচনে তা লোকমুখে ছিল। ডাক বা ডংকরা একসময়ে রোগ নিরাময় এবং যৌবনশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য যা কিছু করত, তাকে বিদ্যা বলত। বিদ্যা থেকেই রোগ নিরাময়ের চর্চা যারা করত তাদের বৈদ্য বলা হত। এটা বেদের বাজীকরণের অন্য এক রূপ। বেজ উপাধিপ্রাপ্ত মানুষেরা এই বাজীকরণের স্মৃতি বইছেন। ১৮০৭ সালের মে সাহেবের অঙ্কপুস্তকং-এর অনেক আগে থেকেই 'শুভঙ্করী আর্য্যা' বাংলার জনমানসে প্রচলিত ছিল। এই আর্য্যা মানে একটা ফর্মুলা। এই ফর্মুলায় ফেলে জমিজমার পরিমাপ, কোনও বস্তুর ওজন এবং মূল্য সম্পর্কিত হিসাব সহজে করা যেত। অনেক আর্য্যা হারিয়ে গেছে। কিছু এখনও লিপিবদ্ধ আছে। আমি একটা বই পেয়েছিলাম, যেখানে অনেক শুভঙ্করী আর্য্যা ছিল। কাঠাকিয়া, গণ্ডাকিয়া এসব ছাড়াও দধিকিয়া, নৌকাকিয়া ইত্যাদি ছিল। সেই বইটা কেউ নিয়ে আর ফেরত দেয় নি। দধিকিয়া হল দইয়ের ভাঁড়ের কতটা দৈর্ঘ্য এবং কতটা বেড় হলে কত পরিমাণ দই ধরবে তার হিসাব। নৌকাকিয়াতে নৌকা কতটা লম্বা হলে, কতটা চওড়া হলে কতটা ধান ধরানোর জন্য কত গভীর করতে হবে সেই হিসাব। ছন্দোবদ্ধ পদে বাঁধা ছিল। এর মধ্যে জলের প্লবতা, নৌকার ওজন এবং নৌকার ভিতরের সামগ্রীর ওজন ইত্যাদি মিলিয়ে জটিল হিসাবের ব্যাপার ছিল। ধানের পরিবর্তে ইট বহন করলে নিশ্চয়ই হিসাব পাল্টে যেত। বাংলার বিভিন্ন নৌকা কারিগরেরা এই হিসাব জানেন। পশ্চিমবঙ্গের বলাগড়ে অনেক রকম নৌকা তৈরি হত।

কিন্তু এইসব জ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক ছিল না। শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র এসব ছিল কিন্তু কারিগরি ব্যাপার ছিল না। কারিগর শ্রেণীর স্থান হিন্দু সমাজে উঁচু ছিল না। আর ইহজীবন সম্পর্কে একটা এমন ধারণা ছিল যে, এই জাগতিক জীবন মায়া। আমরা এক অব্যক্ত স্টেশনের যাত্রী, আমরা প্ল্যাটফর্মে প্রতীক্ষারত। এরকম একটা চিন্তার কুয়াশা আমাদের বাস্তব দৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছিল। পশ্চিমের হাওয়া সেই কুয়াশাকে সরিয়ে দেওয়ার পরই আমাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা এসেছে। একেবারে সেই দিগ্‌দর্শন থেকে অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ হয়ে উৎসমানুষ, কোয়ার্ক, অন্বেষা ইত্যাদি পত্রিকা– একটা দীর্ঘ পরিক্রমা। আস্তে আস্তে কুয়াশা সরেছে। এখনও কুয়াশা আছে। নানা রকমের কুয়াশা।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

ত্রিপুরার গণ্ডাছড়ায় জ্যান্ত মা কালী!

সেই আশি-নব্বইয়ের দশকে উৎস মানুষ পত্রিকায় এ ধরনের প্রতিবেদনধর্মী লেখা খুব ছাপা হত। অনেক দিন পর ত্রিপুরা থেকে এই লেখাটি এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে, সময় এগিয়েছে, কুসংস্কার, বুজরুকি রয়ে গিয়েছে সেইখানেই।– সঃ

ভগবানের অবতাররা মাঝে মাঝে দেখা দেন। এবার স্বয়ং মা কালীই সশরীর হাজির। ত্রিপুরার ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমা সদরের মগপাড়ায়। মা কালীর আশীর্বাদের জেরে যে কোনো মানুষের যে কোনো রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে, এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। প্রচারমাধ্যমও বিষয়টা নিয়ে হৈচৈ শুরু করে। একথাটা প্রায় সবারই জানা, আমাদের দেশে The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 নামে একটা আইন আছে। এই আইনে ঝাড়ফুঁক তুকতাক তাগাতাবিজ থেকে ফুসমন্তরে রোগ ভালো করে দেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। রোগ সারাতে কোনো ধরনের অলৌকিক তথা কাল্পনিক ক্ষমতার প্রয়োগও বেআইনি। এই আইনের ধারা অনুযায়ী কোনো ধরনের প্রচার চালানোও অপরাধ। আইনে বলা আছে-- কোনো প্রকার আলো, শব্দ বা ধোঁয়ার সাহায্যেও কোনোরূপ প্রচার চালানো যাবে না। এই আইনের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে– 'Advertisement' includes any notice, circular; label, wrapper, or other document, and any announcement made orally or by any means of producing or transmitting light, sound or smoke; এবং ঐন্দ্রজালিক নিদান সম্পর্কে বলা হচ্ছে– "Magic remedy" includes a talisman mantra kavacha, and any other charm of any kind which is alleged to possess miraculous powers for or in the diagnosis, cure, mitigation treatment or prevention of any disease in human beings or animals or for affecting or influencing in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals।

গত ৩০ জানুয়ারি সকালে কমলপুর মহকুমা থেকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা গণ্ডাছড়া মহকুমায় যান ওই বুজরুকি ফাঁস করে জনগণকে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে। যাওয়ার আগে তাঁরা মহকুমাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এসডিএম তাঁদের ঘটনাস্থলে প্রচারসভা করতে পরামর্শ দেন। থানায় বড়বাবু এবং স্থানীয় সিপিএম পার্টির নেতা সন্তোষ চাকমার সঙ্গেও কথা বলা হয়। এই প্রতিবেদকও সদস্যদের দলে শরিক হয়। আমরা

সোজা গণ্ডাছড়া থানায় চলে যাই। সেখানে বড়বাবু আমাদের সঙ্গে এক গাড়ি পুলিশ দিয়ে দেন। দুজন মহিলা পুলিশ কর্মীও। বড় বাবুই আমাদের জানিয়ে দেন শান্তিকালীর আসল পরিচয়। এই শান্তিকালী আসলে একজন পুরুষ। তাঁর বাড়ি সদর চম্পক নগরের চন্দ্রপাড়ায়। বাবার নাম রাধারাই দেববর্মা। বয়স আনুমানিক ৩২ বছর। বড়বাবু আরো জানান, ইতিমধ্যেই ঐ আখড়ায় ২২জনের একটি কমিটি গড়া হয়েছে সমস্ত বিষয়টা তদারক করার জন্যে। আমরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে পুলিশের গাড়ির সঙ্গে মগপাড়ার দিকে যাওয়ার পথে স্থানীয় এসডিএম সাহেবের সঙ্গে। তিনি বলেন, তিনিও ওখানে আসবেন এবং একটা মাইক পাঠাবেন। আমরা ওখানে গিয়ে দেখি অনেক মানুষ হাতে হাঁড়ি নিয়ে লাইন দিয়ে বসে অপেক্ষা করছেন। জায়গাটাকে ঘিরে রীতিমতো জমজমাট ব্যাপার। অনেক দোকান বসে গিয়েছে। দোকানে পণ্য বলতে জলের বোতল, কালীর ছোট্ট বাঁধানো ছবি, ধূপকাঠি, আপেল আর মাটির হাঁড়ি। মগপাড়ায় গিয়ে দেখলাম, একটা বড় টিলার উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত বিশাল ঢালু জমির জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। টিলার উপরে উত্তর প্রান্তে টিনের চাল আর বাঁশ দিয়ে একচালা একটা ঘর। সেটাকেই মন্দির হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই মন্দিরের সামনের দিকটা লাল কাপড় দিয়ে আড়াল করা। বাঁ দিকে একটা মঞ্চ বানিয়ে মাইক লাগিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। হাঁটু পর্যন্ত লাল ধুতি পরা কয়েকজন আদিবাসী সন্ন্যাসী মাইকে প্রচার চালাচ্ছিলেন। কখনও বাঙলায়, কখনও ককবরক ভাষায়। ঘোষণা করা হচ্ছিল– এখানে পুজো দিয়ে শান্তিমায়ের থেকে আশীর্বাদ নিয়ে গেলে, যে কোনো রোগ ভাল হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের বেশভূষা অনেকটা গাজন সন্ন্যাসীদের মতো। সামনের ঢালে নিদান নিতে আসা প্রার্থীদের লাইনটা দেখার মতো। ইংরাজি জেড অক্ষরের মতো আঁকাবাঁকা লাইন খুবই সুবিন্যস্ত। এই মোবাইল ফোনের যুগে এ ধরনের প্রচার চাউড় হতে বেশিদিন সময় লাগে নি। কাতারে কাতারে লোক সমাগম শুরু হয়ে যায় কদিনেই। কমিটির সদস্যরা সবাই কপালে সিঁদুর লেপে রেখেছিলেন, পুণ্যার্থীরা যাতে সহজেই তাঁদের চিহ্নিত করতে পারেন।

ওঁদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করতেই এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দেন ওঁদের পাণ্ডা বীরঞ্জয় দেববর্মা আর বীরকুমার দেববর্মা। কথা বলে জানা যায়, ওঁরা চৈত্র দেববর্মাকে শান্তি মা এবং শান্তি দেবী নামেই ডাকেন। কেউ কেউ শুধু মা বলে সম্বোধন করেন। এই দুজনের সঙ্গে আমরা ছবিও তুলেছি। ওঁরা জানালেন, চৈত্র এই ক্যাম্পে এসেছেন ২৬ জানুয়ারি। তার আগে আরেকটা ক্যাম্পে ছিলেন ২২ জানুয়ারি থেকে। চৈত্র নাকি তাঁদেরই একজনের স্ত্রীর শরণাপন্ন হন স্থানীয় বাজারে এবং এখানে আসার জন্যে। বারবার মিনতি করায়, ঐ মহিলা নিয়ে আসেন তাঁর বাড়িতে। এতক্ষণ সবই ঠিকঠাক ছিল। ইতিমধ্যে এসডিএম সাহেব মাইক পাঠিয়ে দিয়েছেন ঘটনাস্থলে। তখন অস্থায়ী ক্যাম্পঘর থেকে পর্দা উঠে গেল। চৈত্র দেববর্মা ওরফে শান্তিকালী আমাদের সামনে গেটের কাছে এসে হাজির হয়ে রোগী অথবা রোগীর পক্ষ থেকে আসা নিদান প্রার্থীদের সঙ্গে একে একে কথা বলে নির্দেশ আর আশীর্বাদ আর বিভূতি বিলোতে লাগলেন। তখন ওইখানে উপস্থিত ছিলেন দুজন সাংবাদিকও। তাঁরা অনেক ছবি তুলছিলেন। তিনজনকে আশীর্বাদ শেষ করতেই, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক দুলাল ঘোষ চৈত্রকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর আয়ু কতদিন। দুলালকে চৈত্র বললেন, তার আয়ু তিন বছর। চৈত্র ক্রুদ্ধ হয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, দুলাল ঘোষ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবে তিন বছরের মধ্যে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার আয়ু কত ? চৈত্র বললেন, আমার আয়ুর নাকি ঠিক নেই। দুলাল ওঁর বয়স জানতে চাইলেন। ঠিক সেই সময় বীরকুমার পরিস্থিতি বুঝে চৈত্রকে ফিসফিস করে বলেন যে, আমরা সাংবাদিক। আমাদের ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস নেই। মুহূর্তে চৈত্র ভয়ঙ্কর চটে যান। উত্তেজিত হয়ে দুলালের ওপর ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে ভস্ম করে দিতে নানা অঙ্গভঙ্গী করে অভিশাপ দিতে থাকেন। বলেন, পত্রিকায় ওঁর কোনো খবর ছাপানো চলবে না। আমাদেরও নানাভাবে হুমকি দিতে থাকেন। এমনকি ভূমিকম্প ঘটানোর হুমকিও দেন। কয়েক মিনিট এক পায়ে দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করে ভূমিকম্প সৃষ্টি করছেন, এমন ঘোষণা করে অঙ্গভঙ্গী করতে থাকেন। কিন্তু এতেও কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে আমাদের কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেন -- আর আশীর্বাদ দেবেন না এবং কোনো চিকিৎসার নিদানও দেবেন না। সোজা মঞ্চে গিয়ে মাইক হাতে নিয়ে চিকিৎসা বন্ধ করার ঘোষণা করে দেন। তখন বীরঞ্জয়রা আমাদের ওপর চড়াও হওয়ার উপক্রম করেন।

আমরা গাড়ির দিকে সরে আসি। ঠিক তখনই চৈত্র মাইকে ঘোষণা করেন, তিনি এই আখড়া ছেড়ে চলে যাবেন। এ কথা শুনেই কমিটির সদস্যরা আমাদের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষ কিন্তু আমাদের ওপর ক্ষেপে যান নি। বীরকুমারসহ অন্য সদস্যদের সঙ্গে তখন সেখানকার দোকানদাররা যোগ দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একজন পুলিশও আমাদের রক্ষা করতে আসেন নি। তাঁরা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সেদিন সব কাণ্ডকারখানা দেখে এবং নানা জায়গা থেকে খবর সংগ্রহ করে যা বুঝলাম তা হল– চৈত্র দেববর্মা আসলে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী। গত ২২ সেপ্টেম্বর খয়েরপুর চৌদ্দ দেবতা বাড়িতে এসে নিজেকে দেবতা হিসেবে দাবি করে বসেন। তখন কয়েকটি যুবক একটি গাড়ি করে তাকে চৌদ্দ দেবতা বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যান। এই খবর ছবি সহকারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। একজন সুস্থ মানুষ এভাবে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দেবতার পূজার বেদিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেবতা হিসেবে দাবি করতে পারেন না। গত বুধবারই (২৪-২-২০১৬) চৈত্র দেববর্মা তাঁর মগপাড়ার আখড়া থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসেন গণ্ডাছড়া থানায়। কিছুক্ষণের জন্যে থানার দখল চলে যায় চৈত্রের হাতে। গণ্ডাছড়া থানায় একটা স্থায়ী কালীমন্দির আছে। সেই মন্দিরে ঢুকে কালীমূর্তির মতো তিনিও মহাদেবের শায়িত মূর্তির ওপর ডানপা রেখে কালীমূর্তির ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে পড়েন। ভিড় জমে যায় থানার চত্বরে। তাঁর সঙ্গে গাড়ি করে এসেছিলেন কমিটির লোকজনেরা। তাঁরা গাড়ি করেই চৈত্রকে নিয়ে কেটে পড়েন থানা থেকে। তার আগে চৈত্র দেববর্মা গণ্ডাছড়া আখড়া থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওখানকার সাধুসন্ত ও কমিটি এবং গজিয়ে-ওঠা দোকানদারদের চাপে উনি ওখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। মনোযোগ দিয়ে আখড়ার ঘটনাবলীকে যদি পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে কতগুলো সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হতেই হয়। প্রথমত, চৈত্র দেববর্মা একজন মানসিক ভারসাম্যহীন। সম্ভবত হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসার দরকার। স্পিরিচুয়ালিস্টরা হিস্টিরিক টাইপের ব্যক্তিকে মিডিয়াম হিসেবে যুগ যুগ ধরেই ব্যবহার করে আসছে। এইসব মিডিয়াম নানা অঙ্গভঙ্গী করে মানুষের আস্থাভাজন হয়ে যান। আমাদের দেশে একমাত্র ফিট (fit/convulsion) হওয়ার সঙ্গেই হিস্টিরিয়াকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। ফিট হওয়া হিস্টিরিয়া রোগের অজস্র লক্ষণের একটা মাত্র। অনেকে বলেন, এ সব অভিনয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান এইসব লক্ষণকে রোগ হিসেবেই চিহ্নিত করে এবং এর চিকিৎসাও করা হয়। মনোরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বইতে পড়েছি, এই রোগে আমাদের পরস্পরনির্ভর দুটো সাঙ্কেতিক তন্ত্র পরস্পর নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই বিভিন্ন ঘটনা, যেমন আপনজনের মৃত্যু, ব্যর্থ প্রেম, আর্থিক বিপর্যয়, লাগাতার দারিদ্র্য, সম্মানহানি, প্রতিকূল সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি এই রোগের কারণ হিসেবে প্রতিভাত হয় ব্যক্তিজীবনে। এদের গুরু মস্তিষ্কের দুর্বলতা নিম্ন মস্তিষ্ককে ক্রমশ গ্রাস করে নেয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক তন্ত্রের দুর্বলতা ও নিস্তেজনার ফলে বিচার বিবেচনা শক্তি কমে যায়। কিন্তু এই বিবেচনা শক্তি ১০০ শতাংশ লোপ পায় না বলেই সাধারণ মানুষ এই রোগের লক্ষণগুলো নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন। তখন রোগীরা আখ্যায়িত হন 'সেয়ানা পাগল' বলে। কেউ কেউ এঁদের বলেন ভণ্ড সাধু। আমাদের দেশে মনোরোগ সম্পর্কে ধারণা এখনো খুবই সেকেলে। তাই এমনটা ঘটে চলেছে দেশব্যাপী। এই আখড়ায় আর যাঁরা জড়িত, তাঁদের মধ্যে একাংশ আছেন, যাঁদের আমরা অতি ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী বলেই জানি। তাঁদের অনেকেই দিনরাত জমায়েত হয়ে থাকছেন। সারারাত কীর্তন করেন। এঁদের নিয়ে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। এঁরাও মানসিক দিক থেকে সবাই সুস্থ নন। ঐ কমিটির সবাই যে স্বার্থপর, অসহিষ্ণু, গুণ্ডা তেমনও নয়। এঁদের কেউ কেউ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণও বটে। ওঁরা মনে করেন যে, চৈত্র দেববর্মার ওপর কালী ভর করছে। যদিও এই ভর হওয়াটা মানসিক রোগেরই লক্ষণ। এর কতগুলো হয় গুরুতর আর কতগুলো লঘুতর। Mental Health Act 1987 অনুসারে এইসব মানসিক রোগীকে চিকিৎসার আওতায় আনার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু কেউ এঁদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। এঁরা সত্যিই অসহায়। অথচ এঁদের এইসব রোগলক্ষণ কাজে লাগিয়ে কিছু লোক যে কোনো রোগ ভাল করে দেওয়ার নামে অসহায় মানুষকে বিনা চিকিৎসায় ঠেলে দিয়ে আরো বিপদের দিকে নিয়ে যায়। যা দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রতিবেদকঃ সুদীপ নাথ

বিস্কুট বনাম ইউরিয়া মেশানো মুড়ি

গৌতম মিস্ত্রি

অনেক কাল আগেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চিঁড়ে, মুড়ির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বিস্কুট, পাউরুটি পরিহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর কথা শুনিনি। উল্টে আরও বেশি করে বিস্কুট-পাউরুটিতে আসক্ত হয়ে পড়েছি। জলখাবারে হাতেগড়া রুটি উধাও। আধুনিক গৃহিণীদের হাতে অত সময় নেই। পাউরুটি কিনে আনো, টোস্টার ঢুকিয়ে সেঁকে নাও, তাতে খানিকটা মাখন বা বিকল্প হিসাবে মার্জারিন মাখিয়ে নাও। ওপরে চিনি বা মরিচগুঁড়ো ছড়িয়ে নিলেই কাম ফতে। স্লাইসড পাউরুটি পাওয়া যায়, এতে কাটার ঝামেলাও থাকে না। পয়সা বেশ খানিকটা বেশি যায়। তা যাক। এক পাউন্ড রুটির দাম ২০ টাকা। ওজন চারশো গ্রাম। তাতে জলই থাকে ৩০ গ্রাম। আমরা তাই সই। আর বিস্কুট তো দাদু খায়, নাতি খায়। এক প্যাকেট বিস্কুটের দামে এক কেজি মুড়ি হয়ে যায়। জিনিসের দাম বাড়ছে বলে আক্ষেপ করি, অথচ মুড়ি মুখে রোচে না, মুঠো মুঠো বিস্কুট সাবাড় করি। বিস্কুটের কাছে এমনিতেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া মুড়ির ওপর খাঁড়ার ঘা কষিয়েছে ইউরিয়া। ফলে মুড়ির বাজার আরও খারাপ হচ্ছে। এই লেখাটা সেই ভুল ধারণা ভাঙতে সাহায্য করবে।— সঃ

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে একবার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওখানকার ভাষায় 'দ্যাশ'। সেটা হল বাংলাদেশের পিরোজপুরে। সারাদিন খেয়া নৌকায় করে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা নামল। কলকাতার আদবকায়দায় অভ্যস্ত নাতিনাতনিদের জন্য দিদিমাকে অনেক ভেবেচিন্তে খাবারের বন্দোবস্ত করে রাখতে হয়েছিল। নমুনা পাওয়া গেল জলখাবারের সময়ে। কাঁসার বাটিতে চা আর কলাই-করা থালায় হলদেটে বিভিন্ন আকারের শক্ত আটার বিস্কুট। দেখে আমার ভারি আশ্চর্য লাগে। তখন নেহাত ছোট। হাফপ্যান্ট পরি। তাই অমন বিস্কুটের দোকান উনি কোথায় খুঁজে পেলেন বা সেই আশ্চর্য বিস্কুট কোন বেকারিতে তৈরি হয়েছিল তা আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সেই বয়সেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় নি, আমাদের বিস্কুট সংস্কৃতি পিরোজপুরের সেই গণ্ডগ্রামে তখনও পৌঁছয় নি। এখন বুঝি, ডাক্তার-বদ্যি বর্জিত গ্রামের লোকগুলো ওষুধপথ্যি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, বাইপাস অপারেশন ছাড়াই কেমন বেঁচেবর্তে থাকত। অকালে বেঘোরে মারা পড়ত না। এই ম্যাজিকের উত্তরটা বোধহয় তাঁদের জীবনশৈলী বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যেতে পারে।

আপাতত সকালবেলার খাবার নির্বাচনের দিকটা খতিয়ে দেখা যাক। বিশ্বে এখন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যে সকালবেলায় এক পেয়ালা চা পান করে না। আর অবধারিতভাবেই সেই চায়ের সঙ্গে টা হিসাবে থাকে বিস্কুট। লেখার শুরুতেই ৪০ বছর আগের এক অজগাঁয়ের যে আলেখ্য পেশ করলাম, সেখানে তখনও মুদিখানায় অর্থাৎ গ্রামের মনিহারী দোকানে বিস্কুট বিক্রি হত না। এঅখন অবশ্য ছবিটা পুরোদস্তুর পাল্টে গেছে, সেটাই স্বাভাবিক। মানব শরীরের সুস্থতা-অসুস্থতা বিষয়ে আমরা যে দেশের বিজ্ঞানীদের দিকে তাকিয়ে থাকি, সেই পশ্চিমী দুনিয়ায় ম্যাকডোনাল্ড-কোকের পরে এবার বুঝি বা কেক-কুকিজ-বিস্কুট মায় সমস্ত বেকারির খাবারই সন্দেহের তালিকায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে বিস্কুটের বদলে চিঁড়ে-মুড়ির মতো দেশজ খাবার খেয়ে অকালমৃত্যু ঠেকাতেন। চিঁড়ে-মুড়ি ভাল, না কেক-কুকিজ-বিস্কুট ভাল, তাই নিয়ে চায়ের কাপে তুফান উঠতে পারে। দৈনন্দিন খাবার হিসাবে চিঁড়ে এখন তেমন জনপ্রিয় নয়। সে তুলনায় মুড়ি অনেক বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তাতেও কিঞ্চিৎ কালো দাগ ফেলেছে ইউরিয়া। মুড়িকে ফুলো ফুলো বড় আর সাদা দেখানোর জন্য নাকি ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়, যে ইউরিয়া আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ। তাই মুড়িপ্রেমীরা কেনার সময় জানতে

চান মুড়িতে ইউরিয়া আছে কি না। অনেকে একটু লালচে এবং ছোট আকারের এক ধরনের মুড়ি পাওয়া যায়, নিরাপদ মনে করে সে দিকে ঝোঁকেন। পাশাপাশি স্বাদে, বৈচিত্র্যে, সুলভতায় বিস্কুট মুড়িকে কয়েক যোজন পিছনে ফেলে দিয়েছে। বাজারে তিন টাকা দিয়ে, যে কোনো বাসের ন্যূনতম ভাড়ার চেয়েও কমে, দিব্যি এক প্যাকেট বিস্কুট পাওয়া যায়। যাঁদের খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না, তাঁদের বন্ধু-পরিজনেরা সঙ্গে বিস্কুটের প্যাকেট রাখার পরামর্শ দেন। বিস্কুটের পক্ষে প্রবল হাওয়া সত্ত্বেও এবং মুড়িতে ইউরিয়া মেশানোর দুর্নাম থাকলেও, আমি মুড়ির পক্ষেই সওয়াল করব। কেন, সেটাই যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করি।

প্রথম পর্বঃ ইউরিয়া মেশানো মুড়ি

ইদানীং বাজারি মুড়ির তৃতীয় সংস্করণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ডাল ভাত রান্নার মতো যে যার ঘরেই মুড়ি বানিয়ে নিতেন। লাল রঙের, একটু ভারী, শীর্ণকায় সেই মুড়ি দেখতে রূপসী না হলেও স্বাদে অতুলনীয় ছিল। খাবারদাবার চোখে দেখার নয়, চেখে দেখার বস্তু। বিস্কুটের পক্ষে যাঁরা জোরালো সওয়াল করেন মুড়ি তাঁদের সামনে কেমন যেন নেতিয়ে যায়, কারণ তাঁরা বলেন, বিস্কুটে ইউরিয়া নেই। মুড়িতে কেউ কেউ অল্প নুনও মেশাতেন, তবে বিস্কুটে নুন ও তার চেয়ে বেশি সোডিয়াম (বেকিং পাউডার) থাকে বলে বিস্কুটপন্থীরা এই ব্যাপারে তর্ক করবেন বলে মনে হয় না। কিছুদিন আগেও মাথায় বস্তা করে কলকাতার আশপাশের গ্রামের মহিলারা ঘরে তৈরি যে মুড়ি বেচতে আসতেন, সেই মুড়ি এই প্রথম সংস্করণের। এঁরা লুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে নাম লিখিয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই মুড়ি নাম পাল্টে, শোভন মোড়কে তৃতীয় সংস্করণের 'অর্গানিক মুড়ি' হিসাবে এখন উচ্চমূল্যে শপিং মলে শোভা পায়। অমজনতার জন্য পড়ে থাকে দ্বিতীয় সংস্করণের ইউরিয়া মেশানো, হাল্কা ফুল্কা, সাদা ধবধবে, দৃষ্টিনন্দন, স্ফীত কলেবর, প্লাস্টিকের প্যাকেটে সজ্জিত মুড়ি। এখনকার যুগদর্শন হল 'পহলে দর্শনদারি'। প্রথমে দেখনদারিটি চাই, সে জিনিস আদপে যাই হোক না কেন। মুড়ির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। দেখতে ভাল না হলে, তা মুখে রুচবে না। বাজারের সিংহভাগ দখল করার জন্য এই মুড়িকে ইউরিয়ার ফেয়ারনেস ক্রিমের প্রলেপ লাগাতে হয়েছে। মুড়ির সৌন্দর্যের গোপন রহস্য আর গোপন রইল না। সাদা আর চকচকে মুড়ির আকর্ষণে আমাদের পেটে ঢুকে যাচ্ছে অবাঞ্ছিত ইউরিয়া। এইখানেই প্রশ্ন ওঠে— মুড়ির সঙ্গে খানিকটা ইউরিয়া খেলে আমাদের ক্ষতিটা কী? একশো গ্রাম মুড়িতে কতটা ইউরিয়া থাকে ? তা আমাদের অদুর-সুদুর ভবিষ্যতে কতটা ক্ষতি করতে পারে। সত্যি বলতে কি, এ বিষয়ে দেশীয় নির্ভরযোগ্য তথ্য বিরল। একটি জাপানি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বাজারে বিক্রি হওয়া বহুল ব্যবহৃত ইউরিয়া সার দেওয়া জমিতে উৎপন্ন চাল পালিশ করার পরে তাতে ইউরিয়ার মাত্রা ৭০ শতাংশ কমে গিয়ে প্রতি ১০০ গ্রামে ১১.৬ মিলিগ্রামে দাঁড়ায়। মুড়ির ক্ষেত্রে ইউরিয়ার মাত্রা এর চেয়েও কম পাওয়া গিয়েছে।

ইদানীং বিষম প্রতিযোগিতার কারণে বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে মুড়ি সাদা ধবধবে, আকারে বড় আর চকচকে করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এটা কাম্য ছিল না। মুড়িকে রূপসী করে তুলতে অনুমোদন ছাড়া ইউরিয়া নামে এক জৈব যৌগ, যেটা কিনা অজৈব উপায়েও প্রস্তুত করা যায়, ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেল। এই মুড়ি বড় কারখানায় বিপুল পরিমাণে তৈরি হতে লাগল। ঘরে তৈরি ছোট লালচে মুড়িকে হটিয়ে দিয়ে দখল নিল বাজারের। এখন হেরে যাওয়া লালচে মুড়ি আপনি দোকান বা শপিং মলে খুঁজেই পাবেন না। অর্থাৎ আমাদের সামনে ইউরিয়া মেশানো মুড়ি ছাড়া বিকল্প কিছু রইল না। এর পরেও আমি সেই তর্কটা থেকে সরছি না— কোনটা ভালো, বিস্কুট না ইউরিয়া মেশানো মুড়ি।

বিশুদ্ধ অর্গানিক মুড়িকে আমজনতার সামনে হাজির করা এই মুহূর্তে যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন ইউরিয়া মেশানো মুড়ি আমাদের কী কী ক্ষতি করে বা অদৌ কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে কি না, সেটা নিয়েই পড়া যাক। তবে এটাই ঠিক, বাজারে ন্যায্য মূল্যে ও সহজে পাওয়া যায় না বলেই কৃত্রিম উপায়ে সাদা ও দৃষ্টিনন্দন ইউরিয়া যুক্ত মুড়ি আমরা কিনতে বাধ্য হই।

আসি ইউরিয়া প্রসঙ্গে। ওষুধ হিসাবে ইউরিয়া আমরা মাঝেমধ্যেই ব্যবহার করে থাকি। অনেক সময় তা অকিঞ্চিৎকর কারণেও। ময়শ্চারাইজিং ক্রিমে ইউরিয়ার ব্যবহার বহুকাল ধরে চলে আসছে। উল্লেখ্য, কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বলে কয়েক বছর আগেও বিনা দ্বিধায় ইউরিয়া ব্যবহার হত মাথার খুলির মধ্যে বেড়ে যাওয়া রক্তচাপ কমানোর জন্য। সঙ্গত কারণে অবাঞ্ছিত বা বিকৃত

ও বড় আকারের মানব ভ্রূণের দায় থেকে মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও (গর্ভপাত) অতীতে ওষুধ হিসাবে ইউরিয়ার ব্যবহার হয়ে এসেছে তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। এই তথ্য প্রমাণ করে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা ভেজাল হিসাবে ইউরিয়া বোধহয় তেমন একটা ক্ষতি করে না।

ইউরিয়া-ভীতির সম্ভাব্য কারণ

এটা অনেকটা জন্ডিস হলে হলুদ না খাওয়ার কুযুক্তির সঙ্গে তুলনায়। জন্ডিস বা হেপাটাইটিস হলে চোখ, চামড়া, প্রস্রাব হলদে হয়ে যায়। যা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় হলুদ খেলে এই হলদে ভাব তথা জন্ডিশ আরও বেড়ে যাবে। তাই যথাযথ কারণ ছাড়াই হলুদ খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিডনির রোগে রক্তে ইউরিয়া বেড়ে যায় এই খবরটা এখন রাষ্ট্র হয়ে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ কোনো একটা সত্য বা আধাসত্য জনমানসে ক্রমশই দাবানলের মতো ছড়াতে থাকে আর মানুষের সীমাহীন কল্পনা তার ভোল পাল্টাতে থাকে। ইউরিয়া খাবার সঙ্গে কিডনির রোগ সৃষ্টির সমীকরণে একফোঁটাও সত্য নেই। একটা উদাহরণ পেশ করা যাক। মধুমেহ (ডায়াবেটিস) রোগে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। তাই বলে সুস্থ মানুষ চিনি বা গ্লুকোজ খেলে তার প্যাঙ্ক্রিয়াস নষ্ট হয় না, ডায়াবেটিসও হয় না। মধুমেহ রোগী এমনিতে চিনি খেলে তার খুব একটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে তাকে মোট ক্যালোরির হিসাবটা মেনে খেতে হবে আর খাবারে চিনি থাকলেও ফাইবারসমৃদ্ধ খাদ্য নিয়ে খাবারের থালাটিকে সুষম করে তুলতে হবে। এই ব্যাপারটা মধুমেহ রোগে আক্রান্ত বোদ্ধা ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করেন, হিসেবি রুগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞগণও বলে থাকেন। কিডনির রোগে ইউরিয়া বেড়ে যায়, এটা মিথ্যে নয়। মানুষের শরীরে প্রোটিন জাতীয় অর্থাৎ নাইট্রোজেন যুক্ত যৌগ তার কর্মকাণ্ড শেষ হলে ইউরিয়ায় পরিণত হয়। এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ঘামের মাধ্যমে আর মুখ্যভাগ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। বৃক্ক (কিডনি) ঠিকমতো কাজ না করলে তাই অনুপাতিক হারে রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। রক্তের ইউরিয়া এ ক্ষেত্রে কিডনির কর্মক্ষমতা নির্ণয়ের একটা মাপক ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্তের ইউরিয়ায় মাত্রা নির্ণয় করে কিডনির কর্মক্ষমতা নিরূপণ করা হয়ে থাকে, যদিও এই পদ্ধতিটা নির্ভুল নয়। কল্পনাপ্রিয় মানুষ অতি সহজেই তাই ধরে নিল, ইউরিয়া খেলেই বুঝি কিডনি বিগড়ে যাবে। এই ধারণা কতটা বাস্তব দেখা যাক।

খাবারের ও মাংসপেশির প্রোটিনের দহন বা পরিপাকের অন্তিম যৌগ ইউরিয়া (NH_2-C = C-NH_2)। এটি মানুষ সহ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। রঙ এবং গন্ধহীন ইউরিয়া জলে সহজে গুলে যায় আর জলের মতোই এর কোনো অম্লতা বা ক্ষারীয় বৈশিষ্ট্য নেই (pH 7)। প্রাণীর ওপরে ওর কুপ্রভাব একদম নেই বললেই চলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ইঁদুরের শরীরের প্রতি কিলোগ্রামের ১৫ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া প্রয়োগে প্রাণনাশকের ৫০ শতাংশ ক্ষতিসাধন হয় (LD_{50},lethal dose$_{50}$ of urea is 15g/kg for rats)। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কৃষিকাজে নিরাপদে ইউরিয়া সারের প্রয়োগ করা চলে। সরাসরি ইউরিয়া না খেলেও বেঁচে থাকার অঙ্গ হিসাবে শরীরের মাংসপেশীর থেকে শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় যথেষ্ট ইউরিয়া উৎপাদিত হতেই থাকে। এ ছাড়া, 'ইউরিয়া চক্রের (Urea cycle)' মাধ্যমে অ্যামোনিয়া আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়ায় যকৃতে ইউরিয়া তৈরি হয়ে থাকে। মুড়ির মাধ্যমে কণিকা মাত্র যে ইউরিয়া শরীরে ঢোকে, তার তুলনায় অনেক বেশি ইউরিয়া শরীর নিজেই তৈরি করে। অর্থাৎ, অবাঞ্ছিত হলেও, মুড়ির সঙ্গে ইউরিয়া খেয়ে ফেললে রক্তের ইউরিয়ার মাত্রার হেরফের ঘটার সম্ভাবনা নেই। ভয় নেই কোনো শারীরিক ক্ষতি হওয়ার। বৃক্কের কর্মক্ষমতা কমে গেলে রক্তে দ্রবীভূত অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে ইউরিয়াও বেড়ে যায়। রক্তের ইউরিয়া কিডনির ক্ষতি করে না। একটু তলিয়ে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, কিডনির রোগে রক্তে পটাশিয়ামও বেড়ে যায়, অথচ কিডনি সুস্থ থাকলে খাবারের পটাশিয়াম (তাজা ফলে পাওয়া যাবে) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। খাবারের সঙ্গে গৃহীত ইউরিয়া নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে, অনেকটা পরিমাণে ইউরিয়া খেয়ে ফেললে বড় জোর পেটব্যথা, বমি ও পাতলা পায়খানা হতে পারে। মানুষের মূত্রে অনেক পরিমাণে ইউরিয়া থাকে। শোনা যায়, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই ঘুম থেকে উঠে স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় হিসাবে নিজের মূত্র পান করতেন। এটিকে তন্ত্রের পরিভাষায় 'শিবাম্বু' বলে। কাকতালীয় কিনা জানা নেই, তবে তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ বেকারির কেক, কুকিজ, পাউরুটি ও বিস্কুট

বেকারিতে যে সব খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তার প্রক্রিয়াকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। প্রথমত, এই খাবারের অধিকাংশে মাখন আর কয়েকটিতে সম্পৃক্ত ভোজ্য তেল ও আংশিকভাবে হাইড্রোজেন যুক্ত অসম্পৃক্ত 'ট্রান্স ফ্যাট' বা বনস্পতি ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়ত, বেকিং পদ্ধতিতে অল্প তাপমাত্রায় অনেকক্ষণ ধরে খাবার প্রস্তুত করা হয়। এটি স্বাস্থ্যকর রন্ধন প্রক্রিয়া নয়। তৃতীয়ত, সুস্বাদু ও দৃষ্টিনন্দন করার জন্য বিস্কুট ও অন্যান্য বেকারির খাবারে মূল খাদ্যাংশ হিসাবে আটার বদলে সাদা অতি রিফাইন্ড প্রক্রিয়াকৃত শস্যদানা হিসাবে ময়দা ব্যবহার করা হয়, প্রচুর পরিশোধিত চিনি মেশানো হয়। বিস্কুটের মতো এত বেশি শক্তি-ঘন (ক্যালোরি ডেন্স) খাবার খুব কমই আছে।

বেকারির ব্লো ১ঃ সম্পৃক্ত তেল

কেক বা কুকিজে ইয়ামি মাখনের উপস্থিতি তো প্রস্তুতকর্তারাই বিজ্ঞাপিত করে থাকেন। মাখন যে সম্পৃক্ত ফ্যাট, এটা আর কে না জানে! ভোজ্য উদ্ভিজ্জ তেল, খাবার উপযোগী স্নেহ জাতীয় পদার্থ বা পরিভাষায় 'এডিবল ফ্যাট' প্রধানত দুই প্রকার– (১) সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যেটা হৃদরোগের ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের অন্যতম কারণ এবং (২) অসম্পৃক্ত বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (ট্রান্স ফ্যাট বাদে), যা মানবশরীরের পক্ষে উপকারী। আমাদের দৈনিক খাবারের কোটায় সম্পৃক্ত ফ্যাটের স্বাস্থ্যকর ঊর্ধ্বসীমা ৩০ শতাংশ হলেও সেটা মূলত অসম্পৃক্ত স্নেহ জাতীয় খাদ্য থেকে আসা উচিত। ২০০৩ সালের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও আমেরিকার খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার (Food and agriculture organization) যৌথ বিবৃতিতে মাত্রাতিরিক্ত সম্পৃক্ত তেল গ্রহণকে সরাসরি হৃদরোগের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে। দেখা গেছে, মাত্রাতিরিক্ত সম্পৃক্ত তেল গ্রহণে রক্তে ক্ষতিকর লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা (Low density lipoprotein cholesterol, LDL cholesterol) বৃদ্ধি পায়। এর ফলে, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের মতো মারণাত্মক রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। স্থূলতায় না ভোগা একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, যাঁকে রোজগারের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না, ক্যালোরির মাপে তাঁর দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন ১২০০-২০০০ ক্যালোরি। আসলে এটা কিলোক্যালোরি; খাদ্যের শক্তির একক উল্লেখ করার সময় কিলোক্যালোরির বদলে কেবল 'ক্যালোরি' বলাই চল। প্যাকেটজাত খাবারে শক্তি বা এনার্জি বলে যে এককের উল্লেখ করা থাকে তা কিলোক্যালোরির বদলে কেবল ক্যালোরি বলে ছাপা থাকলেও তা কিলোক্যালোরি বুঝতে হবে। প্রথা অনুযায়ী, কিলোক্যালোরি বোঝানোর জন্য বড় হাতের 'সি' ও ক্যালোরি বোঝানোর জন্য ছোট হাতের 'সি' লেখার বিধান আছে। কিন্তু এই প্রথা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব কমই মানা হয়। ক্যালোরির মাত্রায় আমাদের খাবারের পরিমাণের মধ্যে মোট ও সম্পৃক্ত ফ্যাটের ঊর্ধ্বসীমা হবে যথাক্রমে ৩০ ও ৭ শতাংশ। অর্থাৎ মোট ফ্যাট সীমিত থাকবে ৪০০ ক্যালোরি থেকে ৭০০ ক্যালোরি। যেহেতু ১ গ্রাম ফ্যাট থেকে ৯ ক্যালোরি পাওয়া যায়, দৈনিক ফ্যাট গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা হবে ৫০ গ্রাম থেকে ৮০ গ্রাম। এর সর্বাধিক এক চতুর্থাংশ আসবে সম্পৃক্ত ফ্যাট থেকে। তাহলে হিসাব বলছে, দৈনিক সম্পৃক্ত ফ্যাট গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা হবে ১২ থেকে ২০ গ্রাম। এই হিসাবটা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অভ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর অনুমোদিত ঊর্ধ্বসীমার সঙ্গে মিলে যায়।

ভাল তেলে তৈরি বিস্কুটের র‍্যান্সিডিফিকেশন এড়ানোর জন্য ট্রান্স ফ্যাটের উদ্ভাবন ঃ

আপনি হয়তো সস্তা পড়ছে বলে বড় এক প্যাকেট বিস্কুট কিনলেন। একবারে পুরোটা খাওয়া যাবে না বলে কৌটোয় ভরে রাখলেন। প্যাকেট খোলার দু তিনদিন বাদে বিস্কুটে স্বাদ বিস্বাদ লাগার কথা। এটা দামি বিস্কুট আর চানাচুর জাতীয় খাবারে বেশি হয়। তেমনটা না হলেই বরং দুর্ভাবনা বেশি। একটু তলিয়ে দেখলেই কারণটা বোঝা যাবে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল উদ্ভিজ্জ তেলে (ট্রান্স ফ্যাট নয়) প্রস্তুত খাবার প্রস্তুত করার পরে বেশিদিন অবিকৃত থাকে না, উন্মুক্ত আবহাওয়ায় বিস্বাদ হয়ে যায় (র‍্যান্সিড)। ট্রান্স ফ্যাটে তৈরি খাবারে এমনটা হবে না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বেকারির মালিকেরা অসম্পৃক্ত তেলে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন অণু যুক্ত করে কৃত্রিম উপায়ে ট্রান্স ফ্যাট উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তেলে (নন ট্র্যান্স ফ্যাট) প্রস্তুত খাবারের ফ্যাট আবহাওয়ার জল আর অক্সিজেনের সংস্পর্শে ছোট শৃঙ্খলের যৌগ কিটোন ও অ্যাল্ডিহাইডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একে র‍্যান্সিড হওয়া বলে। বিস্বাদ হওয়া ছাড়াও র‍্যান্সিড বিস্কুটের পুষ্টিগুণ ও

ভিটামিন অনেকাংশে কমে যায়। এই কারণে বেকারিতে তরল উদ্ভিজ্জ ফ্যাটের চেয়ে আংশিক হাইড্রোজেন যুক্ত ও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন ট্র্যান্স ফ্যাট বা বনস্পতি অধিক প্রিয়। এই ফ্যাটে প্রস্তুত খাবার তৈরি হবার পর খাবার অনেকদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। হয়ত খেয়াল করেছেন, তরল উদ্ভিজ্জ ফ্যাটে বারবার রান্না করা যায় না, ভাজার পরে কড়াইতে পড়ে থাকলেও ব্যবহারের পরে ফেলে দিতে হয়। ট্রান্স ফ্যাটে এই অসুবিধা কম। এজন্য ট্রান্স ফ্যাট বেকারির ব্যবসাদারের কাছে বেশি প্রিয়। ট্রান্স স্যাচুরেটেড ফ্যাট, সংক্ষেপে ট্রান্স ফ্যাট নিকৃষ্টতম এক বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ত ফ্যাট যে ফ্যাট আমাদের অগোচরে খাবার টেবিলে পৌঁছে যাচ্ছে। হৃদপিণ্ডের ক্ষতি করার জন্য এর মতো ক্ষতিকারক ফ্যাট আর হয় না। ট্রান্স ফ্যাট যেমন ক্ষতিকারক লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরল বাড়ায় আবার অপরদিকে হৃদপিণ্ডের সুরক্ষায় থাকা গুরু ঘনত্বের কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয়। ট্রান্স ফ্যাটে তাই দ্বিগুণ ক্ষতি। দুধ আর মাংসে অল্প পরিমাণে প্রাকৃতিক ট্রান্স ফ্যাট থাকে। কিন্তু আধুনিক মুখরোচক খাদ্য ব্যাপারির দৌলতে ট্রান্স ফ্যাটের মুখ্য উৎস হচ্ছে বুলবুল ভাজা থেকে বেকারির খাবার। বেকারিতে মাখনের পরেই রান্নার তেল হিসাবে আংশিকভাবে হাইড্রোজেন যুক্ত বনস্পতির তেল বেশি ব্যবহার হয়। আংশিকভাবে হাইড্রোজেন যুক্ত হবার ফলে ফ্যাটের গঠন 'সিস (sis)' থেকে 'ট্রান্স (trans)'-এ পরিবর্তিত হয়।

হালে ট্রান্স ফ্যাট মিডিয়ার আর স্বাস্থ্য সচেতন পশ্চিমী দুনিয়ার অভিভাবক সংস্থাদের কুনজরে এসেছে, অপপ্রচার পেয়েছে। তাই বেকারির খাবারের প্যাকেটে 'ট্রান্স ফ্যাট শূন্য' তকমা আঁটার ধুম পড়েছে। কিন্তু আপনি কী করে জানবেন যে, প্যাকেটের গায়ে লেখা না থাকলেও, খাবারে ট্রান্স ফ্যাটের অংশ শতকরা ০.৫ শতাংশের কম হলেই 'শূন্য ট্রান্স ফ্যাট' লেখা যাবে। শূন্য ট্রান্স ফ্যাট যেহেতু সত্যি সত্যিই ট্রান্স ফ্যাট বর্জিত নয়, তাই যাঁরা নিরাপদ খাবার হিসাবে সকাল সন্ধে বিস্কুট চিবোচ্ছেন, অগোচরে তাঁদের পেটে বেশ খানিকটা ট্রান্স ফ্যাট ঢুকে যেতে পারে। প্যাকেটের লেবেল আইনের ফাঁক গলে যে সব পরিচিত খাবারে ট্রান্স লুকিয়ে থাকে সেগুলি হলঃ বেকারির খাবার– অধিকাংশ বিস্কুট, কেক, কুকিজ, পাই, আলুর চিপস, পপকর্ন, পাউরুটি, ডুবো তেলে ভাজা খাবার, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ডোনাট, ভাজা মুরগির মাংস (ফ্রায়েড চিকেন), টিনের বাক্সবন্দী বিস্কুট, অর্ধপক্ক হিমায়িত খাবার (প্রসেসড পিৎজা, চিকেন ইত্যাদি), দুধবিহীন কফি ক্রিম, মার্জারিন ইত্যাদি।

(বাকি অংশ পরের সংখ্যায়)

তথ্যসূত্র ঃ

১. Journal of the brewing society of Japan, vol 83 (1988), No 2, p 136-141

২. https://en.wikipedia.org/wiki/Rancidification

৩. http://www.mayoclinic.org/trans-fat/art-20046114

৪. Trans fat content in labeled and unlabelled Indian bakery products including fried snacks, Reshma et al. International Food Research Journal 19(4): 1609-1614 (2012)

৫. উৎস মানুষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ (৩৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯)

৬. https://law.resource.org/pub/in/bis/S06/is.1011.2002.pdf

৭. https://archive.org/stream/gov.in.is.1011.2002/is.1011.2002_djvu.txt

৮. উৎস মানুষ এপ্রিল-জুন ২০১৪ (৩৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২১)

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উযুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন **নম্বরঃ** ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

বিশ্বাসে মিলায় বদ্যি

ভবানীপ্রসাদ সাহু

জার্মানিতে একসময় এক জমিদার ছিলেন, ব্যারন ফন মুনশ্‌হয়সেন (Baron Von Münchhausen)। তাঁর খ্যাতি ছিল মিথ্যা কথা বলার জন্য। সুদক্ষ অভিনেতার মতো অভিনব মিথ্যার আবিষ্কার করে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তা সবাইকে বলতেন। তাঁর নামে একধরনের রোগের নামকরণ করা হয়েছে মুনশ্‌হয়সেন সিন্ড্রোম (Münchhausen Syndrome) নামে। এতে রোগী এক ধরনের ব্যক্তিত্বের বৈকল্য বা মানসিক রোগের শিকার হন। রোগী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিজের মনগড়া অসুখ নিয়ে ডাক্তারের কাছে যান, এমনকি সাঙ্ঘাতিক হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, তীব্র পেটের ব্যথা ইত্যাদি নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেন। স্বাভাবিকভাবে জানা না থাকলে বাড়ির লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরাও তা বিশ্বাস করেন। ঐভাবে তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাওয়া হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসক নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এক্স-রে, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাফি, রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি করান। কিছুই হয়ত পাওয়া গেল না, কিংবা সামান্য যা পাওয়া গেল তা 'রোগের' বর্ণনার সঙ্গে মিলল না। ব্যবসায়িক চিকিৎসাকেন্দ্রে কিছুটা আন্দাজ করেও হয়ত ব্যয়বহুল নানা 'চিকিৎসা' করা হল। তাতে রোগী 'সুস্থ' হয়ে উঠল। কিন্তু এই রোগের শিকার যে রোগী সে আবার অনেক সময় অন্য নামে, অন্য ধরনের রোগের কথা বলে চিকিৎসকের কাছে ছোটে।

কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার-বিবেচনা করে চিকিৎসক যদি বোঝেন যে, রোগীর আসলে কিছুই হয় নি এবং তা রোগীকে ও তাঁর বাড়ির লোককে বলেন, তবেই ঘটে সর্বনাশ। চিকিৎসকের বাপবাপান্ত করে গালাগালি, হাসপাতাল-চেম্বার ভাঙচুর এবং অন্য হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়া। দ্বিতীয় জায়গায় রোগীর বেশ খরচ করিয়ে চিকিৎসা করা হলে অনেক সময় সে 'সুস্থ' হয় এবং দ্বিতীয় হাসপাতাল বা ডাক্তারের জয়জয়কার হয়। কিন্তু রোগীর যদি সত্যিই মুনশ্‌হয়সেন সিন্ড্রোম থাকে, তবে আবার কিছুদিন পরে একই বা ভিন্নতর 'সাঙ্ঘাতিক' সমস্যা নিয়ে ছোটাছুটি করে।

এটা ঠিকই যে, প্রকৃত রোগীর তুলনায় এই ধরনের 'মিথ্যারোগের' রোগীর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্যি, বেশ কিছু রোগী নানাধরনের বানানো মৃদু রোগের কষ্ট নিয়ে যেমন আসেন, তেমনি এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তীব্র রোগকষ্টের কথাও বলেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই ধরনের রোগর জন্য প্রায়শই চিকিৎসককে হেনস্থা ও অপমানিত হতে হয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগীর ভূমিকা তথা চিকিৎসক-রোগী সম্পর্ক প্রসঙ্গে এই বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে বলার কারণ, কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসক নিগ্রহের পিছনে এইভাবে মিথ্যা-রোগ বানানোর 'রোগ'ও যে বড় ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষের প্রায় কোনো ধারণাই নেই। অথচ, বাস্তবক্ষেত্রে অনেক চিকিৎসককেই তার মুখোমুখি হতে হয়। চিকিৎসক যদি ব্যাপারটি আঁচ করে পরিস্থিতি সামলাতে পারেন, তবে ভালো। কিন্তু তথাকথিত ঐ রোগীর ভালোর জন্য এবং আত্মীয়স্বজনের ভবিষ্যতের হয়রানি এড়ানোর জন্য সত্যি কথাটাই বুঝিয়ে বলা উচিত। চিকিৎসকের ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁদেরও ব্যাপারটি বোঝা উচিত। কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে চিকিৎসকের ও হাসপাতালের ওপর এই বিশ্বাসেই অনেকটা চিড় খেয়েছে। এর পেছনে বাস্তব কারণ কিছুটা আছেই, বিশেষত চিকিৎসার নামে ক্রমবর্ধমান ব্যবসার ব্যাপারটা বহু মানুষই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জেনে গেছেন। নিছক টাকার জন্য রোগীর মৃত্যুর পরেও আইসিইউ-তে ভর্তি রেখে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালানো, অপ্রয়োজনে হৃৎপিণ্ডে স্টেন্ট বসানো বা অস্ত্রোপচার করা, এড়ানো সম্ভব হলেও সিজারিয়ান ও অন্যান্য অস্ত্রোপচার করে দেওয়া, কমিশনের লোভে বিশেষ ল্যাবরেটরিতে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর জন্য চাপ দেওয়া, ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিশেষ কোম্পানির বিশেষ দামি ওষুধ কিনতে বাধ্য করা, নার্সিংহোমে ভর্তি রোগীকে প্রচুর ওষুধ কেনানো এবং পরে অব্যবহৃত ওষুধ অন্য রোগীকে বা নিজেদের ঐ ওষুধ দোকানে চালান করা— এ ধরনের ঘটনা এখন গোপন সত্য। আর এসব কারণে কয়েক দশক আগেও চিকিৎসককে 'ভগবানের' আসনে বসিয়ে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা এবং সম্মান করার ব্যাপারটি দ্রুতহারে কমে আসছে। ব্যতিক্রমী চিকিৎসক ও চিকিৎসা কেন্দ্র নেই তা নয়। কিন্তু চারপাশের সামাজিক অর্থগৃধ্নুতা ও ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এঁদের সংখ্যাও দ্রুত কমছে।

এসব কথাই সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমানে পান থেকে চুন খসলে যেভাবে রোগী ও তাঁদের বাড়ির লোকজন এবং আরো বেশি করে সংবাদমাধ্যম চিকিৎসকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তার পেছনে যৌক্তিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে যথেষ্ট কম। বেশি করে কাজ করে অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও অজ্ঞতা, অসহিষ্ণুতা, আবেগ এবং এই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে থাকে 'পাবলিককে খাওয়ানো' তথা নিজেদের প্রচার (টিআরপি) ও ব্যবসা বাড়ানো। বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানুষকে সচেতন করার যে সামাজিক কর্তব্য সংবাদমাধ্যমের পালন করা উচিত, তার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অচিকিৎসক সাংবাদিকের চমক দেওয়া সংবাদ পরিবেশন। অনেক ক্ষেত্রেই তা থাকে নিজের মতো করে বিকৃত ও পরিবর্তিত করা। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনার মুখোমুখি চিকিৎসকদের হতে হচ্ছে এবং তার জন্য আইনি হয়রানি ও সামাজিক সম্মানহানির শিকার হতে হচ্ছে। এ ধরনের দু-একটি ঘটনার কথা বলা যাক।

পরিচিত এক স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগতভাবে সিজারিয়ানের চেয়ে স্বাভাবিক প্রসবের ওপরই বেশি জোর দেন। এর ইতিবাচক দিকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। যাই হোক, একবার এক মহিলার গর্ভাবস্থার শেষের দিকে আলট্রাসনোগ্রাফি করিয়েও শিশুর অবস্থান ও অন্য সব কিছু স্বাভাবিক বলেই জানা গিয়েছিল, আধাসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা ঐ মহিলাকে ভোররাতে গিয়ে তিনি দেখেও এলেন, সবই ঠিক আছে, কিছুক্ষণ পরেই স্বাভাবিক প্রসব হবে। সিস্টাররা রয়েছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খবর এল মৃত অবস্থায় শিশুটি জন্ম নিয়েছে। তার গলায় নাড়ি (অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ড) জড়িয়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে শিশুটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির লোকের হৈচৈ শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিচিত এক সাংবাদিককে খবর দেওয়াও হয়ে গিয়েছে। পরের দিন সংবাদপত্রে 'মৃত্যুর পর শিশুর চিকিৎসা' জাতীয় শিরোনাম দিয়ে খবর বেরোল। বাড়ির লোক ঐ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন।

মুশকিল হচ্ছে, বিরলভাবে হলেও স্বাভাবিক প্রসবের সময়ও শিশুর গলায় হঠাৎ নাড়ি (কর্ড) জড়িয়ে যেতেই পারে। উন্নত দেশে যেখানে সবসময় নজরদারির (মনিটরিং) ব্যবস্থা আছে, সেখানে হয়ত এটি এড়ানো যায়, তাও সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আর আমাদের এখানকার সাধারণ হাসপাতালের পরিকাঠামোয় তা আদৌ বোঝা যায় না। এ ক্ষেত্রে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দুর্ঘটনাটি ঘটে যেতে পারে। অল্প কিছুক্ষণ আগে মৃত শিশুটিকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে কিছু করাটাও চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু বাড়ির লোকের আবেগ এবং পুরো পরিস্থিতিটা বোঝার মতো মানসিকতার অভাব বাস্তব সত্যকে বিকৃত করে তুলল। চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকা সাংবাদিক মৃত শিশুকে বাঁচানোর চেষ্টাকেও অনৈতিক হিসেবে উপস্থাপিত করে চিকিৎসক ও হাসপাতালটিকে চিকিৎসার অবহেলায় মৃত্যুর দায়ে অভিযুক্ত করল। বেশ কিছুদিন অনিচ্ছাকৃত হত্যার মামলা চলার পর সামান্যতম প্রমাণ ও যুক্তির অভাবে তা খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু মাঝখান থেকে দীর্ঘদিন মানসিক নিগ্রহ ও সামাজিক অপমানের শিকার হতে হল ঐ চিকিৎসককে।

এ ক্ষেত্রে অন্তত বাড়ির লোকের বোঝা উচিত ছিল, যে চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে এসেছেন, তাঁর করণীয় কর্তব্যে ঘাটতি থাকা অস্বাভাবিক এবং কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, তা জেনে যুক্তি সহকারে ব্যাপারটি গ্রহণ করা। কিন্তু তাৎক্ষণিক আবেগ তাঁদের এই যুক্তিবোধটাকেই নষ্ট করে দেয়।

এর অর্থ এই নয় যে চিকিৎসকের অবহেলা, দক্ষতার অভাব ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি রোগীর কোনো বিপদ ঘটায় না। তার জন্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের শরণাপন্ন হওয়াটাও দরকার। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, এই ধরনের বহু অভিযোগের পেছনে সত্যিকারের অবহেলা ইত্যাদির চেয়ে, রোগীর ও তাঁর বাড়ির লোকের আবেগ ও কিছু

ভুল ধারণাই কাজ করে।

এই ধরনের ভুল ধারণা অনেক সময় তথাকথিত নানা ওষুধের ক্ষেত্রে প্রায় কুসংস্কারের পর্যায়ে পৌঁছেছে। যেমন কাশির সিরাপ, টনিক, ভিটামিন, হজম আর গ্যাসের ওষুধ সম্পর্কে এই ধরনের কিছু ধারণা অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ডিউটির সময় এক সন্ধ্যেবেলা এক মহিলা ৮-১০ বছরের মেয়েকে নিয়ে এলেন কাশির জন্য। হলুদ কফ উঠছে। সামান্য জ্বর। পরীক্ষা করে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হল। কিন্তু মায়ের আবদার কাশির সিরাপ দিতে হবে। রোগীর ভিড়ের মধ্যে যতটুকু বোঝানো যায় বলা হল। কিন্তু পরে ঐ আবদার প্রায় আদেশের পর্যায়ে পৌঁছল এবং 'কি ঘোড়ার ডিমের ডাক্তার' ইত্যাদি বলে রেগে বেরিয়ে গেলেন। এই ধরনের নানা তথাকথিত ওষুধ সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান চিকিৎসকের পক্ষে এমনই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই 'জ্ঞানও' মানুষ অর্জন করেছে বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রচার আর কিছু চিকিৎসকের রোগীর ও ওষুধ কোম্পানির মন রাখা প্রেসক্রিপশনের কল্যাণে। কাশির সিরাপ তো অতি সাধারণ একটি উদাহরণ। আরো নানা ওষুধপত্র, অস্ত্রোপচার, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও রোগীর পক্ষ থেকে এই ধরনের নানা অযৌক্তিক চাপ আসে।

বিশেষ করে বহু স্বচ্ছল রোগীদের মধ্যে এমন মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে যে, দামি ওষুধ লিখলেই ও বেশি ফি নিলেই তিনি ভালো ডাক্তার, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা পরীক্ষা না করালে সন্তুষ্টি আসে না। এখন সাধারণ এক্স রে-তে রোগীর মন ভরে না, এম আর আই করালে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন এবং গর্ব করে সবাইকে বলেও বেড়ান এত টাকা দিয়ে এত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়েছে। আর এক শ্রেণীর চিকিৎসক এতে ইন্ধনও জোগান।

রোগী হিসেবে সচেতনতা অবশ্যই দরকার। কিন্তু মানুষের শরীর ও চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি কার্যকর স্তর পর্যন্ত সচেতনতাও সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা করা যায় না। রোগী হিসেবে নিজেদের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এখনকার অনেক মানুষই সচেতন নন। তাঁরা নিজেদের সবজান্তা ভেবে বসেন এবং বিনা কারণে চিকিৎসকের দোষত্রুটি, অবহেলার অভিযোগ তুলে মারধর ভাঙচুর চালান।

এভাবে মার খেতে খেতে বেঁচে যাওয়ার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়। ঐ ইমার্জেন্সি ডিউটির সময়ই মৃত অবস্থায় এক রোগীকে (brought dead) আনা হল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়ির লোক বিশ্বাস করতেই চায় না, রোগী মারা গিয়েছে। তক্ষুনি অক্সিজেন, স্যালাইন, ইনজেকশন ইত্যাদি না দিলে প্রায়ই গালাগাল শুনতে হয়, এমনকি চিকিৎসককে নিগ্রহ করার ঘটনাও ঘটে অথচ মৃত ব্যক্তিকে লোকঠকানো ঐসব দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। এই রোগীর ক্ষেত্রেও বাড়ির লোক বারবার বলতে থাকে রোগী মারা যায় নি। অনেক বুঝিয়ে ক্ষান্ত করা গেল। সরকারি হাসপাতালে মৃত অবস্থায় কাউকে আনলে পুলিশ কেস, ময়না তদন্ত ইত্যাদি করতেই হয়। এ জন্য অনেকেই রোগীকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিচিত কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে নেন। তবে অস্বাভাবিক মৃত্যু সন্দেহ হলে এভাবে ছাড়া হয় না। যাই হোক এই রোগীর ক্ষেত্রে মৃত্যুটা স্বাভাবিকই ছিল। পুলিশ কেস, পোস্ট মর্টেম ইত্যাদির কথা শুনে বাড়ির লোক মৃতদেহ নিয়ে চলেও গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা ফিরে এলেন সঙ্গে আরো কিছু উত্তেজিত লোকজন এবং ক্যামেরা সহ একজন সাংবাদিককে নিয়ে। নানা ধরনের গালাগাল করতে করতে তাঁরা যা জানালেন, রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার সময় রোগীর হাত পা নড়েছে, কী করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হল! সভয়ে আবার রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা গেল ইতিমধ্যে রাইগার মর্টিস অর্থাৎ হাত-পা শক্ত হতে শুরু করেছে। তখন পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হল, রাইগার মর্টিস হলে যে হাতটাত ভাঁজ হয়ে যায় তাও জানানো হল, তাঁদের দেখানোও হল। শেষ অব্দি তাঁরা ব্যাপারটা বুঝলেন। তবে মাঝখান থেকে গালাগাল জুটল— এসেই মারধর ভাঙচুর শুরু করে নি, এই যা রক্ষা। আরো রক্ষা এই যে, তাঁরা এই অভিযোগ অন্তত করেন নি যে, রোগী মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিল, কোনো চিকিৎসা না করে ফেরত পাঠানো হয়েছে আর এর ফলে রাস্তায় মারা গিয়েছে।

বাস্তবত এই ধরনের অভিযোগ নিয়েও মাঝে মাঝে চিকিৎসককে মারধোর, হাসপাতাল ভাঙচুর চলে। কিন্তু তাৎক্ষণিক আবেগে না ভেসে, রোগীর বাড়ির লোকজন একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে যদি যুক্তিযুক্ত আচরণ করেন তবে এই ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

মনে রাখা দরকার, কোনো চিকিৎসকই সচেতনভাবে রোগীর কোনো ক্ষতি হোক, তা কখনই চান না। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে রোগীর ভালো করারই আপ্রাণ চেষ্টা করেন। নিজের পেশাগত নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে তো বটেই, এমনকি কিছু চিকিৎসক বড় বেশি ব্যবসায়িক হলেও নিজের পেশাগত সুনামের স্বার্থেই রোগীর ক্ষতি করতে চান না, এই ধরনের কোনো চিকিৎসকের লাগামছাড়া ব্যবসায়িক কাজ কারবার নিন্দনীয় হলেও। পাশাপাশি এটিও রোগী ও তাঁর বাড়ির লোকের মাথায় রাখা দরকার, বিশেষত সরকারি হাসপাতালে একজন চিকিৎসক স্বল্প সময়ে অজস্র রোগীর চিকিৎসা করতে বাধ্য হন। মাত্রাতিরিক্ত চাপ নিয়ে সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে, স্বল্পসংখ্যক চিকিৎসক ও সিস্টার কাজ করেন। ইনডোরের ৩০টি বেডের জন্য নির্ধারিত চিকিৎসক-সিস্টারকে হয়ত ৬০-১০০ জন ভর্তি থাকা রোগীর চিকিৎসা করতে হয়। এদের মধ্যে বেশিরভাগ রোগীই সুস্থ হয়ে ওঠেন বা উপশম পান। চিকিৎসকই হোন বা সিস্টার— সবাই মানুষ। তাঁদের মধ্যেও মানুষের স্বাভাবিক দোষগুণ, ক্লান্তি, সিদ্ধান্তের খামতি ইত্যাদি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের অবহেলা ত্রুটি অবশ্যই প্রতিবাদযোগ্য, কিন্তু এই প্রতিবাদের ভাষা যখন শালীনতার সীমা ছাড়ায় এবং শারীরিক নিগ্রহ ও ভাঙচুর পর্যন্ত গড়ায়, তখন সেটিও নিন্দনীয়। এসব আটকাতে আইন করা হয়েছে। কিন্তু আইন দিয়ে সবকিছু ঠিক করা সম্ভব নয়।

রোগী ও তাঁর বাড়ির লোকজনকে এসব মাথায় রেখে মনে রাখা দরকার যে, চিকিৎসক ও সিস্টাররা তাঁদের শত্রু নন। চিকিৎসককে ভগবানের আসনে বসিয়ে অন্ধ বিশ্বাস করার মানসিকতাও যেমন না থাকাই ভালো, তেমনি পান থেকে চুন খসলেই, কোনো কিছু তলিয়ে না দেখে, ভালো করে পুরো ব্যাপারটি না জেনে, উগ্র হিংস্র আচরণ ও অশালীন ভাষা প্রয়োগও মানুষ হিসেবে রোগী ও তাঁর বাড়ির লোকজনকে ছোটই প্রমাণিত করে। চিকিৎসক, সিস্টার, হাসপাতালের কর্মচারী এঁদের বন্ধু হিসেবেই মনে করা উচিত। অবশ্যই চিকিৎসকদেরও দায়িত্ব আছে নিজেদের এই বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালানো। এই চেষ্টায় ঘাটতির কারণেও হয়তো সম্প্রতি চিকিৎসকদের ওপর নিগ্রহ বাড়ছে।

উমা

শিক্ষা কিনবেন বাব... খাসা বিলিতি শিক্ষা?

সুদেষ্ণা ঘোষ

শিষ্যটি খড়ি দিয়ে কালো বোর্ডে লিখে চলল— গরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর...। 'একি, ওটা তো গরু হয়ে গেছে!' হাসিমুখে বললেন গুরুদেব। শিষ্য জিভ কেটে তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিল। খুশির মেজাজে শিক্ষা শুরু হল। সকলেরই ঠোঁটের কোণে তখনও হালকা হাসির চিহ্ন। গুরুদেব আর কেউই নন সরোদসম্রাট ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, সেনিয়া মাইহার ঘরানার স্রষ্টা আচার্য বাবা আলাউদ্দিন খাঁর সুযোগ্য পুত্র। তালিম দিচ্ছিলেন ভারতীয় শাস্ত্র সঙ্গীতের প্রথম পদক্ষেপ- গুরুকে শ্রদ্ধা করা।

শুধু সঙ্গীত জগতেই নয়, সকল ক্ষেত্রেই গুরুকে শ্রদ্ধা করা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এমন কথাও বলা হয়— শ্রদ্ধা বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এ যুগের মানুষ কার্যে সিদ্ধিলাভকেই সবকিছুর ওপরে স্থান দেয়। শিক্ষিকা হিসাবে আমার কাছে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় সিদ্ধিলাভের একটি প্রধান অর্থ প্রকৃত মানুষ হওয়া। যিনি উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকা, তাঁর ছাত্রছাত্রী ভাল মানুষ হলেই সিদ্ধিলাভ, পড়াশোনা তো আছেই। একবিংশ শতাব্দীতে সিদ্ধিলাভ কথাটি পৌরাণিক কাহিনীর পাতা থেকে উঠে এসেছে মনে হবে। এই আধুনিক যুগে শিক্ষায় সিদ্ধিলাভকে এক কথায় অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্ট বলা হয়। আজকাল ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনা ছাড়াও আরো অনেক দিকেই উন্নত হতে হয়। যেমন— খেলাধুলা, আঁকা, নাচগান, শিল্পনৈপুণ্য, ক্যুইজ, ডিবেট, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদি। আগে এসব কিছুকে বলা হত এক্স্ট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ। তার মানে পড়াশোনা ছিল প্রধান, এগুলি ছিল উপরি পাওনার মতো। এখন নতুন নামকরণ করে একস্ট্রার নিম্ন ধাপ 'কো' কারিকুলার-এর উচ্চ ধাপে আরোহণ করে এসব অন্যান্য বিষয়ের মান বেড়েছে। পড়াশোনার পাশের স্থান অধিকার করে কখনো কখনো তাকে জনপ্রিয়তায় ছাপিয়ে গেছে এসব বিষয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রাধান্য বদলেছে, তেমন বদলেছে গুরু-শিষ্য অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্ক। গুরু-শিষ্য পরম্পরা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে গুরুগৃহ। যেখানে শিষ্য বাস করে। গুরুর সেবা করে শিক্ষালাভ করে। তা সে মহাভারতের গুরু দ্রোণাচার্যের কুটিরই হোক বা গত শতাব্দীর বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মাইহারের বাড়িই হোক। আজকাল গুরুগৃহ ছোট ছোট ফ্ল্যাটে পরিণত হয়েছে। সেই দরাজ মনের গুরু যেমন নেই, শিষ্যদের মধ্যেও সেই শ্রদ্ধা নেই। সিদ্ধিলাভের আরো অনেক সর্পিল পথে নিজেদের চালনা করতে তারা সিদ্ধহস্ত এবং সেসব পথে চলার সিদ্ধান্তে অনড়। এ হেন অবস্থায় গুরু-শিষ্য পরম্পরা যে লুপ্তপ্রায়, তা পাঠক নিজেই বুঝতে পারছেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক কিছুটা টিকে আছে, তবে তাও কষ্টেসৃষ্টে। কারণ আজকাল এসব সঙ্গীতের বাজারদর কমে গেছে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের অভাবে। যে জগতে গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রচলন ছিল, সেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতেই গুরু-শিষ্যরা লড়াই করছেন, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের অবস্থা কী হতে পারে, দেখা যাক।

ফিরে আসি শিক্ষা জগতে। এখানেও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীর সম্পর্কের মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা এখন বাজারি পণ্যসামগ্রী। শিক্ষক-শিক্ষিকা দোকানদার, ছাত্র ছাত্রী এবং তাদের বাবা-মা ক্রেতা। ক্রেতা পরিতৃপ্তির দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষভাবে নজর রাখতে হয়। শুধু ভাল পড়ালেই চলবে না। এই নতুন ভাবনা নিয়ে আজকাল স্কুলে কিছু কর্মশালাও হয়েছে। একটি কর্মশালার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। দিল্লী থেকে যে মধ্যবয়সী মহিলা সেটি পরিচালনা করেছিলেন, তিনি দক্ষ, তীক্ষ্ণধী এবং রসিক বলে অনেক শিক্ষিকাই সেদিন জেগে ছিলেন! আমি অবশ্য বাড়িতেই ঘুমোতে পছন্দ করি। যাই হোক, তিনি ক্রেতা পরিতৃপ্তির কথা বোঝাতে 'সিসিডি'তে কফি খাওয়ার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে শুধু কফি ভাল হলেই চলে না, যিনি দিচ্ছেন তাঁর ব্যবহার, টেবিলের পারিপাট্য, আশপাশের পরিবেশ, সবকিছুর ওপরেই ক্রেতার সন্তুষ্টি নির্ভর করে। কথাটা ঠিকই। তবে শিক্ষিকা হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের ক্রেতা ভাবতে কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করি। সর্বদা হাসিমুখে তাদের এবং তাদের বাবা-মায়েদের সুখী রাখা কোনো ভাল শিক্ষিকার আদর্শ হতে পারে না।

একথা ঠিকই যে, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বেতনভুক কর্মচারী। তবুও শিক্ষাদানকে সামগ্রী বেচার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কারণ এই 'কেনা-বেচার' মধ্যে জড়িত আছে একটি মানুষ। ছাত্র বা ছাত্রী এবং তাদের জীবন। কখনো কখনো শিক্ষিকাকে তাঁর ছাত্রছাত্রীর মঙ্গলের জন্য এমন কিছু করতে হয়, যা তার এবং তার বাবা-মায়ের অপছন্দ হতে পারে। এখানে যদি শিক্ষিকা 'ক্রেতা পরিতৃপ্তির' কথা মনে রেখে কাজ করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সেই ছাত্র বা ছাত্রীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে এ কথা খুব কম বাবা-মা বোঝেন এবং অনেক সময়ে অন্যায়ভাবে তাঁদের সন্তানের ভুল কাজকে সমর্থন করেন। এতে আরো একটি জিনিসের ক্ষতি হয়, যা চোখে দেখা যায় না, তা হল গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্কের, যা ছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরার ভিত্তিপ্রস্তর।

শিক্ষাজগতে, মানুষ গড়ার জগতে, একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটাই মূলধন। গুরু-শিষ্য পরম্পরাকে ভুলে, আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে, বিদেশী পদ্ধতিকে আমরা আঁকড়ে ধরেছি। উন্নত দেশে তো বাজারই জীবনের অনেক কিছু চালিত করে। একে কী বলব? বিশ্বায়নের ফলে অগ্রসর হওয়া, নাকি নিজেদের সংস্কৃতিকে বিশ্বায়নের হাঁড়িকাঠে বলি দেওয়া?

১৮ বছর শিক্ষকতা করার সুবাদে গুরু-শিষ্য বা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী সম্পর্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ হয়েছে। এই নতুন চিন্তাধারার স্রোতে যখন মন প্রায় ডুবতে বসেছে, তখন ছেঁড়া মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি মারা রোদ্দুরের মতো পুরনো কিছু কথা মনে পড়ছে। সম্পর্কের কথা।

অষ্টম শ্রেণীতে ভূগোলের অঙ্ক করাচ্ছি। বোঝানো শেষ হতে বললাম 'বাড়িতে অভ্যাস করবে, কিন্তু ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা চলবে না'। একটি ছাত্রী মৃদু হেসে বলল, 'বাড়িতে ব্যবহার করলে কী করে বুঝবেন?' আমি অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিলাম, 'আমি জানি কেউ করবে না, কারণ আমি বারণ করেছি।' পরে জেনেছিলাম, সত্যিই কেউ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে নি। খুব সামান্য একটা ঘটনা, খুব বড় একটা শিক্ষা। বিশ্বাস করতে পারার শিক্ষা, ভরসা

করতে পারার শিক্ষা, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে শিক্ষিকাকে শ্রদ্ধা জানানোর শিক্ষা। গুরু-শিষ্যের গভীর সম্পর্কের একটা ছোট্ট উদাহরণ।

আর একটি ঘটনা। নবম শ্রেণীতে প্রথম ক্লাসটিচার হয়েছি। সাবধানে পা ফেলতে হবে, অন্য শিক্ষিকারা বলেই দিয়েছেন। ক্লাসে কেউ কেউ মোবাইল ফোন এনেছে ব্যাগে লুকিয়ে। তখন স্কুলে মোবাইল আনা বারণ ছিল। ক্লাস মনিট্রেস সকলের ব্যাগ খুঁজে কিছুই পেল না বা পেলেও বলল না। আমি ক্লাসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলেছিলাম, 'যদি আজকে যারা মোবাইল এনেছে, তারা আমার টেবিলে ফোন না রাখে তাহলে আর কোনোদিন এই ক্লাসকে আমি বিশ্বাস করব না'। একটুক্ষণ চোখে চোখে কথা হল, তারপর ধীরে ধীরে তিনটি ছাত্রী আমার টেবিলে ফোন এনে রাখল। সেদিন ফোন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিনিময়ে ওদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম। যে দু বছর ক্লাসটিচার ছিলাম, ওরা কোনোদিন লুকিয়ে মোবাইল আনে নি।

এগুলি তো গেল শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সম্পর্কের কথা। এছাড়াও রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মায়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্পর্ক। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। দু পক্ষই তটস্থ! কী হয়, কী হয় ভাব। শিক্ষক-শিক্ষিকা মেপে কথা বলেন। এও শোনা গেছে, শিক্ষক বা শিক্ষিকার অজান্তে তাঁর কথা মোবাইলে টেপ করে ছাত্রীকে শুনিয়েছেন বাবা-মা। কারণ হয়ত ছাত্র বা ছাত্রী বাবা-মাকেও বিশ্বাস করে না, প্রমাণ চায়। খুবই অদ্ভুত হয়ে উঠেছে আমাদের জীবন। এই তিমিরেও আলো দেখা যায়, যেমন আমার দেখার সুযোগ ঘটেছিল। আবার নবম শ্রেণী। অভিভাবকের সঙ্গে বৈঠক। একটি ডানপিটে ছাত্রীর বাবা বললেন, 'আমার মেয়েটাকে একটু মানুষ করে দেবেন।' ওঁকে পাল্টা প্রশ্ন করে বলি– 'দেবো। তবে আপনি লিখে দিতে পারবেন, আপনার মেয়ের ওপর আমার অধিকার? আমি বকুনি দিলেও আপনি কিছু বলবেন না?' মেয়ের বাবা কলম নিয়ে বললেন, 'কোথায় লিখব বলুন?' অবলীলাক্রমে সই সমেত লিখে দিলেন 'তাস্‌লিম বিলংস টু ক্লাসটিচার।' সেই লেখা আজও আমি সযত্ন রেখে দিয়েছি। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি, ওঁর মেয়ের সব ভার আমার, দোষ করলেও তার দায় আমার। ছোট ঘটনা, কিন্তু কী গভীর! মনটাকে নাড়া দিয়ে যায়! এর কাছে কোথায় ক্রেতা পরিতৃপ্তি? ওই পিতার বিশ্বাস আমাকে শিক্ষিকা হিসাবে মনে জোর দেয়। ভাবলে শ্রদ্ধায় মন ভরে যায়! এই স্থান থেকে নীচে নামিয়ে শিক্ষকতাকে বাজারি পণ্য কেনাবেচার সমতুল্য করা কি শোভা পায়?

এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা। একজন পুরাতনপন্থী, সাধারণ শিক্ষিকার জীবনের পর্দায় দেখা কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা। বর্তমান জগতে হয়ত এসব চিত্র বেমানান। সেখানকার পটভূমিকায় যা ঘটছে, তা তুলে না ধরলে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আজকাল সবকিছু মাপার একটা চল হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক-শিক্ষিকা কেমন কার্য সম্পাদন করছেন তা জানার জন্য ছাত্রছাত্রীরা কেমন মানুষ হল, তাদের পরীক্ষার ফলাফল, তারা কোথায় পড়ার সুযোগ পেল অথবা প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্ষেত্রে তাঁদের শিষ্যরা জীবনে কী করছে এসব যথেষ্ট নয়। মাপার আধুনিকতম যন্ত্র ফিড্‌ব্যাক এবং ফিড্‌ব্যাক ফর্ম তা নিতে সাহায্য করে। অপরিণত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের লিখিত প্রশ্নপত্র দিয়ে তাদের উত্তর থেকে জানা যায় যে তাদের গুরুরা কেমন পড়াচ্ছেন, কোনো অসুবিধা আছে কি না, তারা তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কত নম্বর দেবে? অনেক অত্যাধুনিক স্কুলে আবার আরো বেশি স্বাধীনতা দেওয়ার সুবাদে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের তাদের গুরুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এসব অভিজ্ঞতা একটি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য সঠিক দিশা দেখাচ্ছে কি না বিচার করা হয় না। তারা অভিযোগ করতে শেখে; দায়িত্বের সঙ্গে পড়াশোনা করার প্রয়োজন শেখে না।

অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদান কথায়, ফিডব্যাক নিয়ে বা টাকায় মাপা যায় না। একটি জীবনের পথে যখন চলা শেখানো হচ্ছে, তখন তার প্রত্যেক পদক্ষেপ কি মাপা সম্ভব? তা হলে তো মায়ের ভালবাসাও মাপতে হয়! ছোট ছোট ঘটনা, রাগ, আনন্দ, দুঃখ, বকুনি, অভিমান মিলেমিশে যায় জীবন প্রবাহের মধ্যে। গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

কেমন করে মাপা যাবে, কী কী কেনাবেচা হল, কে কত খরচ করল, বিনিময়ে কত টাকার বস্তু পেল? আরো সহজে বলি কত টাকার শিক্ষা পেল?

উমা

দুঃখ যখন উৎসবের আসনে

ষড়ানন পণ্ডা

উৎসবপ্রিয় বাঙালি 'বারো মাসে তেরো পার্বণকে' আঁকড়ে রেখেছে। অমল মাস্টারমশাইয়ের মা হঠাৎ মারা গেলেন। বয়স গোটা ৫০ হবে। ভোরে উঠে প্রতিদিনের মতো সকালে ঘরদোর সাফ করেছেন; জামাইবাবুর বাড়ি যাওয়ার তাড়া, তাঁকে জলখাবারও দিয়েছেন। বুকে চিনচিনে ব্যথা। গ্যাস-অম্বল ভেবে নিজেই একটা অ্যান্টাসিড খেয়েছেন। খানিক বাদে অস্বস্তিবোধ, কোনো চিকিৎসার সুযোগ নেই। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। শহর থেকে সুদূরের অখ্যাত গ্রাম, ডাক্তার নেই, হাতুড়েই ভরসা। বন্যায় রাস্তা ধুয়েমুছে গিয়েছে। সবং হাসপাতাল ৮ কিমি দূরে। নিয়তি আর ভাগ্যের ওপর দোষ চাপিয়েই স্বস্তি। ফোনে খবর পেয়ে আত্মীয়েরা ছুটে এলেন। শুরু হল মরণোত্তর উৎসব। শাস্ত্র, সমাজ যুগ যুগ ধরে মানুষের মগজ ধোলাই করে আসছে। বিবেকবুদ্ধি নীরব দর্শক। ভয়াবহ শোকের আবহাওয়া উৎসবের দূষিত বাষ্পে ভরে গেল। চির আদরের গুরুজন মা মৃত্যুর পর মহাপাপী হয়ে গেছেন, প্রাপ্ত হয়েছেন প্রেতযোনি। শবযাত্রায় ঘনঘন 'হরিবোল' ধ্বনি আকাশবাতাস কাঁপিয়ে দিল। খোলকরতাল সহযোগে তারস্বরে হরিনাম যাবতীয় দুঃখ ছাপিয়ে উঠল। আশ্চর্য, এই মুহূর্তে কারও গান শোনার মানসিকতা থাকে! শোকাহত পুত্রকন্যা, পরিজন, প্রতিবেশীদের? পাপিষ্ঠা প্রেতাত্মা মাকে তো টেনে তুলতেই হবে? তাঁর পাপ যাতে আমাদের স্পর্শ করতে না পারে, সে জন্যই এই সংকীর্তন! সবচেয়ে বর্বর আচরণ— উলঙ্গ করে চিতায় তোলা ও মুখাগ্নি করা। এরপর আরও কত বর্বর নিয়মঙ্খ শ্মশান থেকে ফিরে প্রদীপের আগুনে হাত ছোঁয়ানো, মিষ্টিমুখ। চারদিন বাস্তুতে উনুন জ্বলবে না। হাল্কা টিফিন, অন্যের বাড়ি থেকে রান্না করে আনা। শ্রাদ্ধকর্তার কোমরে ঝুলবে কম্বলের আসন, গলায় কাপড়ের ফালির উত্তরীয়, চাবি সমেত, পরতে হবে নতুন থান। অশুচির কয়েকটা দিন জ্ঞাতিদের মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া মানা। শ্রাদ্ধকর্তাকে তৃণশয্যায় শুতে হয়, এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আরামের বিছানার নীচে একটা খড় রাখা হয়। অশৌচের স্কেল জাত অনুসারেঙ্খ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের ১০ দিন, অন্যদের ১৫ দিন। নিম্নবর্ণের অশৌচ-সীমা এখন ৩০ থেকে ১৫ দিনে নেমেছে। জীবদ্দশায় যে মা মাটিতে খাবার পড়ে গেলে সে খাবার খেতেন না, মৃত্যুর পর তাঁকেই পিণ্ড দিতে হয় মাটিতে। পিণ্ডের সামগ্রী হল বীজওয়ালা কাঁঠালি পাকা কলা, তিল, যব, দূর্বা, তুলসী মাখা আধসেদ্ধ ভাত বা চাল। এই পিণ্ড খেয়ে মায়ের শরীর শ্রাদ্ধগ্রহণের উপযোগী হবে। এজন্য প্রতিদিন বিশেষ পিণ্ডচতুর্থী (৪র্থ দিনে), দশাহ (১০ দিনে)। তাই যদি হয়, পিণ্ডদেহ তৈরির আগে মেয়ে ও ভাগ্নের শ্রাদ্ধ ৪র্থ দিনে গ্রহণ করেন কী করে? অশুচি মুক্তির নিয়মও ভিন্ন ভিন্ন— মেয়েরা মায়ের শোকে বোধ হয় বেশি বিহ্বল হয়, কিন্তু তাদের নেড়া হওয়ার বিধি নেই। ছেলে ও নাতিরাই নেড়া হবে মাথা মুড়িয়ে।

আজকাল অনেক শিক্ষিত মাতৃভক্ত মাকে বা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসেন, নয়ত অশিক্ষিত দরিদ্র ভাইয়ের ডেরায় রাখেন। একান্ত উপায় না থাকলে বাড়িতে। তবে সেবাযত্নের পরিবর্তে যে রকম ব্যবহার দেখান, তাতে মা চোখের জল ফেলে তাড়াতাড়ি যমের বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আবার তাঁরাই ঘটা করে শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পাত পেড়ে হাজার জনকে ভূরিভোজ করান।

যমপুরীতে গমনের পথ বড়ই দুর্গম, দ্বাদশ সূর্যের প্রখর তাপ। এজন্য শ্রাদ্ধে পুরোহিত ঠাকুরকে দান করা হয় ছাতা, জুতো, বিছানা-মশারি-খাট। টগবগ করে ফুটছে রক্তপুঁজের বৈতরণী নদী। শ্রাদ্ধে দানের গাভীর লেজ ধরে ঐ নদী পার হতে পারবেন মা অথবা বাবা। এই নদী ওড়িশার বৈতরণী নদী নয়। রাহাখরচ কিছু নগদ দক্ষিণা, কাপড়, চাল-ডাল, কাঁচকলা, মাছও দান করা হয়। শ্রাদ্ধের দিনে মাছ-ভাতের খরচ বাঁচাতে গোপাল-গৌরাঙ্গ এনে ভাগবত পাঠ ও মাইকে হরিকীর্তনও করেন অনেকে, এটাই এখন বেশি চালু। গ্রামে গ্রামে মাসিক শ্রাদ্ধ করা হয়। একবছর পূর্ণ হলে সপিণ্ডকরণ বা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ও গয়ায় পিণ্ড দিতে হয়। এ সময়ও মাথা মুড়োতে হয় ছেলেদের। ছেলের যদি বড় মেয়ে থাকে তাকে তড়িঘড়ি বিয়ে দিতে হলে বিয়ের আগের দিনই একসঙ্গে সবগুলো মাসিক পিণ্ড (শ্রাদ্ধ) দিয়ে সপিণ্ডকরণ করতে হয়।

তাহলে কি আনন্দকে উৎসবের আসনে বসানো সম্ভব? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। জগদ্দল পাথরের মতো বর্বর এই প্রথাকে নিজের জীবনেই বদলাতে হবে। জীবদ্দশায় মা-বাবাকে শ্রদ্ধা, সেবাযত্ন করতে হবে নিজের ছেলের মতো করেই। মৃত্যুর পর তাঁর দেহটাকে পুড়িয়ে বা কবরে অযথা নষ্ট হতে না দিয়ে জীবদ্দশায় মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদানের উপযোগিতা বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি নিজে থেকে বুঝলে স্বেচ্ছায় দলিল করে যাবেন। কর্নিয়া মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত হলে ৩০ লক্ষ মানুষের একজন দৃষ্টি পেয়ে আনন্দিত হবেন। মরদেহের আটটি অঙ্গ অন্য অসুস্থজনের দেহে প্রতিস্থাপন করে তাঁদের সুস্থজীবনে ফিরিয়ে দেওয়া কি আনন্দের নয়? সবচেয়ে বড় কথা, মেডিকেলের ছাত্ররা শবব্যবচ্ছেদের সুযোগ পেয়ে একজন ভাল ডাক্তার হতে পারনে। মা বা বাবাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একটা স্মরণসভা করা যায়। সেখানে মৃত্যু আত্মা মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদানের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা যায়। মা-বাবার সদ্‌গুণাবলী স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আলোচনা করা যায় ছোটদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য। এই সভায় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি-পিতৃভক্তির ঘটনাবলী তুলে ধরা যায়। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ আত্মসুখ বিসর্জনকারী মনীষীদের মনোভাবের বিশ্লেষণ এবং প্রাসঙ্গিক নির্বাচিত কিছু গান, আবৃত্তিও করা যায়। দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের বইখাতা, নগদ টাকা দেওয়া যেতে পারে। প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থদের কিছু কাপড় জামা কম্বল প্রভৃতি সামগ্রী সাধ্যমতো দেওয়া যায়। এরকম অনুষ্ঠান বার্ষিক মৃত্যুদিবসেও করা সম্ভব। এইভাবে আনন্দকে উৎসবের আসনে বসিয়ে দুঃখকে গদিচ্যুত করা সম্ভব।

বাঙালির জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজো, কথাটা আমরা গাল ফুলিয়ে বলি। দুঃখ এই উৎসবের আসনেও...। আমরা জানি এবং শুনি মহালয়ার বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান কিংবদন্তী বেতার শিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের চণ্ডীপাঠ। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' এর মর্মার্থ বোধ হয় কারুর উপলব্ধিতে নেই। এই দুর্গাপূজোতে আমার দৃঢ়সংকল্প- গর্ভধারিণী মায়ের মতো সকল মাকে দেখব। নারীপাচার, নারীধর্ষণ, মেয়েদের উদ্দেশে উপহাস ও কটূ ক্তি প্রভৃতি বন্ধ করার সেরা উপায় ছিল এককালে। এখন চণ্ডীপাঠ তো একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। 'মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে/ খড়ের প্রতিমা পূজিস রে তোরা মাকে তো পূজিস নে/ প্রতিমার মাঝে প্রতিমা বিরাজে, হায়রে অন্ধ দেখিস নে।' প্রভৃতি গান বাজাই, কিন্তু এসবের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে আগ্রহী হই না। এই কারণে পূজো কমিটি ধমক দিয়ে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে। বেতারে বারবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়— জোর করে চাঁদা আদায়কারীকে পুলিশের হাতে তুলে দিন ইত্যাদি। কিন্তু এইসব মাতৃভক্ত তো বহুগুণে ভূষিত। মদ-গাঁজা তাড়ি-তিরঙ্গা দোক্তা-চুরুট বিড়ি-সিগারেটে ডুব দিয়ে রিগিংয়ে হাত পাকিয়ে, পড়াশোনার অধিকাংশ সময়টাতে এফ এম-এ কান রেখে, সিডি প্লেয়ারে চোখ রেখে, রাজনীতির মিছিলে পা ফেলে জাতীয় উৎসবের পুজো কমিটির অ্যাকটিভ মেম্বার হন। এই জন্য পুজোর সময় চলে জুয়ার আড্ডা, দুষ্কৃতীদের লাগামছাড়া দৌরাত্ম্য। ভাসানের দিন উদ্দাম নৃত্য পুজোর বিশেষ আকর্ষণ।

টিভি, রেডিও, খবরের কাগজের পাতায় পুজোর থিম, কোন মণ্ডপে কত লক্ষ টাকা খরচ হয়, কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পুড়ল ইত্যাদি সংবাদ বের হয়। বিদ্যুতের লাগামছাড়া অপচয়, লাগামছাড়া পুজোর বাজেট কি আনন্দের খাতে ব্যয় করা সম্ভব নয়? অপুষ্টি, অনাহার, অর্ধাহারে লক্ষ লক্ষ শিশুমৃত্যু, মায়ের মৃত্যুকে রোধ করা যায়। ফুটপাথের বাসিন্দাদের মাথায় ছাদ, ড্রেন থেকে কুড়িয়ে খাওয়া বুভুক্ষুদের খাবারের ব্যবস্থা অবশ্যই করা যায়। সবার জন্য চিকিৎসা, প্রকৃত শিক্ষার উদ্যোগ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন, বিজ্ঞানসচেতনতা প্রসারের কর্মশালা, মানবিক গুণগুলি বিকাশের আলোচনাসভা, স্বাস্থ্যমেলা, বিজ্ঞানমেলা প্রভৃতি কাজ অবশ্যই করা সম্ভব। এ সব কর্মসূচির বাস্তব রূপদানে কি আনন্দময়ীর আগমনে সকলের মনে আনন্দকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়? যুক্তি-বিবেচনাবিহীন চিন্তাভাবনাগুলোকে ঝেঁটিয়ে ফেলতে হবে। পুরনো সংরক্ষণশীল বা মৌলবাদ চিন্তাভাবনাগুলির অক্টোপাশ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। মুক্তচিন্তা, সুস্থ চিন্তার ব্যাপক বিস্তারের আন্দোলনে নামতে হবে আজই। আমাকে নিজেকেই এই দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। আমাদের উৎসবের আনন্দকে আমরা বসাব, দুঃখকে আমরা গদিচ্যুত করবই— এই আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

উমা

চা-বাগান ঘুরে: দাঁড়াতেই হবে

উত্তরবঙ্গে চা-শিল্পের সঙ্গে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ জড়িয়ে। রেলের পরই সবচাইতে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এই শিল্পে। একের পর এক চা-বাগান বন্ধ হতে থাকায় শতাব্দীপ্রাচীন এই শিল্পের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। শ্রমিকের মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত – এই মৃত্যুমিছিল অনাহারজনিত। কিন্তু দেশের গণতান্ত্রিক সরকার একথা মানতে নারাজ। অপুষ্টিতে মৃত্যু বা চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু বলে চালালে বোধহয় মুখরক্ষা হয়। আর চিকিৎসা না করানোর দায় মৃত শ্রমিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিব্যি হাত ধুয়ে ফেলা যায়। মৃত্যু বোধহয় মানুষের জীবনে একমাত্র নিশ্চিত ঘটনা। আর তা যখন শ্রমিকবস্তির ঘরে ঘরে হানা দেয়, তখন প্লেগ মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হবার কথা মনে করিয়ে দেয়। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলি যেন বধ্যভূমি। সেই ২০০৭-এ মৃত্যুর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে! বেশ কিছু বাগানে দুর্যোগের থাবা। ক্লোজার, লকআউট, কিছুদিন খোলা, আবার ক্লোজার, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, ধর্মঘট, বাগান চালু রাখা ও দেখভালের জন্য কমিটি গঠন– এই চক্করে ঘুরপাক খাচ্ছে চা-শ্রমিকের জীবিকা। চা-গাছের সবুজ শ্যামলিমা, কারখানার ঘর্ঘর শব্দ, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তোলার চেনা ছবিটাই হারিয়ে গেছে। না-ছাঁটা গাছের সারি, নৈঃশব্দ্য, ভূতুড়ে বাংলো, চা-বাগানের সমগ্র অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে। এমনকি বড় বড় গোষ্ঠী মালিকানার চা-বাগানগুলি যা কয়েকবছর আগেও রমরম করে চলত, সেগুলিও প্রায় বন্ধ, নয়ত অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। জলপাইগুড়ির বড়াপানি চা-বাগান ২০১৩-তে বন্ধ হয়। সেখানে এখনো পর্যন্ত ৩২জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। উপজাতি চা-শ্রমিকদের জীবনে গভীর সঙ্কট নিয়ে এসেছে অনাহার। এঁরা বিশেষ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। শ্রমিক বস্তিগুলো বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। বাগানের কাজ ছাড়া অন্য কাজে এঁরা তত পটু নন। চা-বাগানের ঘেরাটোপের বাইরে এঁদের পক্ষে কাজ জোটানো কঠিন। তাই বাগান বন্ধ হলে শুরু হয় অনাহার। সমীক্ষায় দেখা গেছে এইসব শ্রমিকের বডি ম্যাস ইনডেক্স ১৪। এজন্য অপুষ্টি, চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়া আর অপরিচ্ছন্নতাকেই দায়ী করা হয়। দীর্ঘদিন অনাহার ও অপুষ্টিতে শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। সামান্য অসুখেই চা-শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে। এইসব শ্রমিক পরিবারের কমবয়সী মেয়েরা মেয়েপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে। দু মুঠো খাবারের আশায় বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকেরা আশেপাশে নদীর ধারে পাথর ভাঙার কাজ জোটান। তা আর কদ্দিন! দালালের হাত ধরে কেরালা, দিল্লির নির্মাণশিল্পে ঠাঁই হয়। এভাবেই দিন চলে।...

বন্ধ চা-বাগান একনজরে খতিয়ান

- বন্ধ চা-বাগান ডুয়ার্স-৮, জলপাইগুড়ি-৩ এবং আলিপুরদুয়ার -৫
- জলপাইগুড়ির রেডব্যাঙ্ক, ধরনিপুর ও সুরেন্দ্রনগর ৩ বছর আগে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিল এখনও বন্ধ।
- জিপি গোয়েঙ্কা মালিকানাধীন যে যে ১৪টি চা-বাগান বন্ধ ছিল তার ৩টি কিছুদিন হল তা খুলেছে।
- সরকারি হিসেবে ২০১৫ ও ২০১৬-তে ৭৮ জন চা-শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আর বেসরকারি হিসেবে তা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে।

সূত্রঃ্ম টাইমস অভ ইন্ডিয়া, ১৮ জুন ২০১৬

অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, উত্তরবাংলার চা-শিল্পই সামগ্রিক বিপর্যয়ের মুখে। ডানকান গোষ্ঠীর জলপাইগুড়িতে ১৩টি বাগান বন্ধ। ফলে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক কর্মহীন। এখনো সময় আছে– মালিক, শ্রমিক

সংগঠন, টি বোর্ড, সরকার সংশ্লিষ্ট সকলে বসে একটা পথ বার করা দরকার, যাতে করে চা-শিল্প বাঁচে। এছাড়া উপায় নেই। বাগানগুলোতে চায়ের উৎপাদন সমানে কমছে। কিন্তু বাগান চালাবার খরচ বাড়ছে। এ অবস্থায় বাগান চালানো লাভজনক নয়। এভাবে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে, লাভ তো কোন ছার! বাগান বন্ধ করে মালিক কেটে পড়ছে।

পুরনো চা-গাছ, সেকেলে মেশিনপত্তর রেখে বাগান চালালে এর থেকে বেশি কিছু হবার নয়। দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট বাগান মালিকেরা এই অবস্থাতেও ভাল ব্যবসা করছে। তারা উদারনীতির সুযোগ নিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলো পাইকারি চা-ব্যবসার মুনাফা বাড়িয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে শ্রীলঙ্কা, কেনিয়ার সঙ্গেও পেরে উঠছি না। রাশিয়ার বাজার তো আগেই গেছে। এখনো বাজারে ফেরা যায়। সরকার বাগান অধিগ্রহণ করে কিছুটা সামলাতে পারে। শ্রমিক সমবায় গড়ে বাগান চালানো যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে নতুন চা-গাছ লাগানো, ব্যাঙ্ক থেকে সহজ ঋণে টাকা নিয়ে ঠিকঠাক কাজে লাগানো এগুলিই চা-বাগান তথা চা-শিল্পের বাঁচার একমাত্র রাস্তা। মালিক শ্রমিক সবাইকে লক্ষ্য স্থির রেখে এগোতে হবে। বাগান চালাতে পারে, এমন সংস্থা খুঁজে বের করতে হবে। ভুঁইফোড় মালিক দিয়ে হবে না।

মূল লেখাঞ্জ স্টারভেশন ডেথ ইন নর্থ বেঙ্গল টি গার্ডেনস
– সুদীপ চক্রবর্তী

ভাষান্তরঞ্জ বরুণ ভট্টাচার্য

নারীবাদী নাটক ‘প্রাতঃকৃত্য’

‘প্রাতঃকৃত্য’ একটি নাটকের নাম। বহুযুগ ধরে পুরুষতন্ত্র নারীকে নানা নিয়মের নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছে, যা আসলে শোষণেরই নামান্তর। সেই নিয়মগুলো, বিশেষ করে শরীরী, ভাঙার কথাই বলছে এ নাটক। এ নাটকের অনেক কিছুই অভিনব। প্রথমত নাম। প্রাতঃকৃত্য কথাটার আভিধানিক অর্থ– প্রাতঃকালে করণীয় কর্ম; মলমূত্র ত্যাগ, উপাসনা ইত্যাদি। বিষয়ের অভিনবত্বের কারণেই এটি পত্রিকার পাঠকদের কাছে পেশ করা দরবার বলে মনে হয়েছে। প্রচারপত্রে রয়েছে ডান্স থিয়েটার, নৃত্যনাট্য নয়। কথা বলা হবে শরীরী ভাষায়। আমাদের সনাতন ধারণার একটু এদিক-ওদিক হলেই গেল গেল রব তুলি। এ নাটকে প্রচলিত বস্তাপচা ধ্যানধারণার নগ্ন চেহারা, নির্যাতিতা মেয়েদের প্রতিবাদে ফেটে পড়া অসামান্য শরীরী বিভঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, নাটকটি সম্পূর্ণ সংলাপবিহীন।

সন্ধে ৭টায় নাটক শুরু, মিনিট ১৫ আগে হলে ঢুকে দেখা গেল মঞ্চে পাঁচজন যুবতী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের ওপর হালকা আলো। মঞ্চটির দুটি ভাগ। সামনে যুবতীরা আর পিছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে বাজনাবাদ্যি নিয়ে যুবার দল। পরনে ধবধবে সাদা গেঞ্জি আর লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতি, সঙ্গে ঢাক; কাঁধে আলগা গায়ে মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা আর একজন। বাজনা বলতে গিটার, স্যাক্সোফোন, বাঁশি, ঢোল, ড্রাম সেট। সামান্য বাজনার আওয়াজে যুবতীরা একটু হেলে গেল। বাজনার আওয়াজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাচের ধরনও বদলাতে থাকল। পুরুষ যেমন চাইবে মেয়েরাও তেমনি নাচবে। পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য শরীরী ভাষা দিয়ে বোঝানো, পাল্টা উগ্র প্রতিবাদে ফেটে পড়া, বিশেষ করে, সেই দৃশ্য, যেখানে অত্যাচারের আওয়াজ যখন ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে গেল, তখন ঢাকীর পৈতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার ভাবনাটা অসামান্য। পৈতে যেন অত্যাচারের প্রতীক। ‘ছিন্ন করো ছিন্ন করো বন্ধনের এ অন্ধকার...’ মনে পড়ে, সেই ইহুদি ডাক্তারের কথা। প্রফেসর ম্যামলকের বিখ্যাত উদ্ধৃতি ‘there is no greater crime than not wanting to fight when fighting one must’

প্রাতঃকৃত্য-র প্রতিবাদী চেহারাটা বেশ চোখা চোখা। যা শরীরী ভাষা দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা অভিনব। দর্শক তৈরি তো! শহুরে শিক্ষিত দর্শকের কাছে এ নাটকের আবেদন আছে, থাকবে। অবসর বিনোদনের জন্য এরকম কিছু তো একটা চাই, সবাই যে এমনটা মনে করেন, তা বলছি না। তবে নাটকের গায়ে বড্ড এলিট এলিট গন্ধ। আর যুবতী নাট্যকর্মীদের বেশভূষার ছুতো দেখিয়ে এ নাটক বন্ধ করার নোংরা খেলা শুরু হবার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বরুণ ভট্টাচার্য

পদবী পরিক্রমা

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকবি লিখে গিয়েছেন— 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি', আর দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন, 'আমি এটুকুই জানি যে, আমি কিছু জানি না।' পদবী প্রসঙ্গে আলোচনায় এই কথাগুলো খুব খাটে। পৃথিবীর সব সুসভ্য দেশের মানুষেরই একটা পদবী বা সারনেম থাকে। যা দিয়ে তিনি কোন জাতির, বর্ণের, এমনকি ধর্মের তাও বলা যায়। পৃথিবীর সমস্ত পদবীর তালিকা করা দুঃসাধ্য। ভারতবাসীরই যত রকমের পদবী আছে, তার তালিকাতেই একটা মহাভারত হয়ে যাবে। তাই বৃত্তটাকে ছোট করে বাঙালি হিন্দুদের পদবী পরিক্রমা হয়ত চলতে পারে। তবে সেখানেও থই পাওয়া মুশকিল। আমরা সাধারণত অল্প কিছু পদবীর সঙ্গেই পরিচিত। তার বাইরে কত বিচিত্র রকমের যে বাঙালি হিন্দুর পদবী হতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়।

বেশিরভাগ পদবীর উৎপত্তি হয়েছে পূর্বপুরুষের বৃত্তি, জমিদার বা রাজাদের দেওয়া উপাধি, গ্রামের নাম ও রাজকর্মচারীর পদ অনুযায়ী। কর্মভেদ অনুসারে বর্ণাশ্রম ও ক্রমে তার থেকে নানান পদবী এসেছে। পারসিদের মধ্যে যেমন ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি পদবী রয়েছে। রাজা বা জমিদারদের দেওয়া উপাধি, যেমন রায়, চৌধুরি, সামন্ত ইত্যাদিও পরে পদবী হয়ে গিয়েছে। মুসলমান শাসকদের দেওয়া মজুমদার, হালদার, তরফদার, গোলদার ইত্যাদিও কালক্রমে সেই পরিবারের পদবী হয়ে উঠেছে। পদবী ব্রাহ্মণদের একরকম, বৈশ্যদের আরেকরকম, শূদ্রদেরও আলাদা। পদবী দেখে কীভাবে জাতি-বর্ণ চেনা যায়, আমরা সেসব জটিল গভীর আলোচনায় যাব না। আমাদের লক্ষ্য হল পদবীর বৈচিত্র্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

সিংহ, হাতি, বাঘ (বাগ), কুমির, হাঁস, পায়রা, ফিঙে, ঘুঘু— এই সব পশুপাখির নাম পাওয়া যায় বাঙালিদের পদবী হিসেবে। শেয়াল, ভালুক, ছাগল, পাঁঠাও আছে। পশুপাখির নামে পদবী কীভাবে এল, তার ইতিহাস জানা নেই। তবে এতে বৈচিত্র্য যে আছে তা সবাই মানবেন। শহরে ও গ্রামগ্রামান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওই সব বিচিত্র পদবী। শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে কিছু পদবী আবার চমকে দেবার মতো। যেমন গেঁড়ি, চিংড়ি, ফড়িং।

এবার খাদ্যদ্রব্য। গুড়, চিনি, আটা, কাঁঠাল— শুনেছেন কখনও এ পদবী? না শুনলেও আছে। গুড় আবার ব্রাহ্মণ। বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড়কে নিয়ে গল্প লিখেছিলেন। রয়েছে আনাজপাতি নিয়েও। আলু, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, লঙ্কা, পুঁই— সবই একেকটি বিরল পদবী। পদবীতে পাবেন নুন, তেল, লেবুও।

ব্রাহ্মণদের পরিচিত পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়— বাঙালির কথ্যভাষায় হয়ে গেছে বাঁড়ুয্যে, মুখুজ্যে, চাটুজ্যে। তা ইংরেজদের মুখে হয়েছে ব্যানার্জি, মুখার্জি, চ্যাটার্জি, গাঙ্গুলি। তার বাইরে গুড়, হড়, চম্পটি, ঝম্পটি, গড়গড়ি ইত্যাদি কত পদবী রয়েছে! লোকেশ্বর বসুর 'আমাদের পদবীর ইতিহাস' বইয়ের শেষে রাঢ়ী ও গাঞি ব্রাহ্মণদের যে তালিকা দিয়েছেন, তা দেখলে তাদের ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে ঘোর সংশয় দেখা দেবে। একই পদবী কিন্তু ভিন্ন উচ্চারণ, ভিন্ন বানান। এ নিয়ে বাঙালি ব্রাহ্মণদের বহির্বঙ্গে বিভ্রাটে পড়তে হয় মাঝে মাঝেই। ইংরেজিয়ানার সুবাদে আবার রায় হয়ে যায় রয় বা রে, সান্যাল স্যানিয়াল, পাল হয়ে যায় পল।

এবার জোড়া পদবী। দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত, গুহরায়, ঘোষমজুমদার, দত্তচৌধুরি, গুহনিয়োগী, দেবরায়, দেবিশ্বাস, সেনশর্মা, দত্তভৌমিক, হোমরায়— অসংখ্য অজস্র পদবী। এখন এর বাইরেও মেয়েরা স্বামীর পদবীর সঙ্গে নিজেরটা জুড়ে পদবী তৈরি করে নিচ্ছে। এটিকে নারীস্বাধীনতার অঙ্গ বলা যায়। দুইয়ের বেশি পদবী একসাথে জোট বেঁধে আছে সে নমুনা হল— বসুরায়চৌধুরি।

কতগুলো বিচিত্র বাঙালি পদবী দিয়ে শেষ করব আলোচনা। যেমন, হুড়কা, লাঙ্গল, রাস্তা, মাভৈ, পর্বত, ন্যাড়, ঘট, টুং, খিল, খালুই ইত্যাদি। বাঙালির মোট পদবীর সংখ্যা প্রায় হাজার এবং তা ক্রমবর্ধমান। শেষ পর্যন্ত পদবী পরিক্রমা কোথায় গিয়ে থামে সেটাই দেখার। উমা

রূপকথা থাক, অতীন্দ্রীয় গল্প বাদ দিয়েঙ্গু ডকিন্স

শিশুদের রূপকথার গল্প শোনানো কি ক্ষতিকারক? বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী তথা একজন পুরো দস্তুর নাস্তিক এবং 'স্বার্থপর জিন' ও 'ঈশ্বর বিভ্রম' সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স এই প্রশ্নটাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, রূপকথা 'অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী এক বিশ্বের ধারণাকে' শিশুর মনে গেঁথে দেয়। চেল্টেনহ্যাম বিজ্ঞান উৎসবে এক বক্তৃতায় জানান, ৮ বছর বয়সেই তিনি ধর্মে বিশ্বাস হারান, আর সান্তা ক্লজের ফাঁকিবাজি তাঁর কাছে যখন ধরা পড়ে, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২১ মাস।

একেবারে ছোট থেকেই শিশুদের বিজ্ঞানেরশিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত, এই হল তাঁর স্পষ্ট অভিমত।

দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ তাঁর তোলা প্রশ্নগুলোকে উদ্ধৃত করে লিখছেঙ্গু 'শৈশবের অলীক কল্পনা, যার এক জাদুকরী প্রভাব পরবর্তী জীবনে রয়ে যায়, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল? নাকি তাদের মনে সংশয়বাদী চেতনার উন্মেষ ঘটানো উচিত?'

'এই বিশ্বে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, এমন একটা ধারণা শিশুদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াটা সত্যিই ক্ষতিকর। এসব কল্পনা এমনিতেই যথেষ্ট রয়েছে। যেমন ধরা যাক, ডাইনি বুড়ির গল্প বা রাজকুমারীর ব্যাঙ হয়ে যাওয়া। কোনো মানুষ ব্যাঙ হয়ে যেতে পারে না, এটা নেহাতই অসম্ভব।'

তাঁর এই মতের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অধ্যাপক ডকিন্স রূপকথার গল্পগুলোকেই ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছেন, এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। অগত্যা টুইটারে তিনি তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি যে প্রশ্নটা তুলে ধরেছেন, তার ভুল মানে করা হচ্ছে। তিনি লিখলেন, 'শিশুকে অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী করে তোলা অবশ্যই ক্ষতিকারক। কিন্তু রূপকথা কি এ কাজ করে? প্রশ্নটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আর এর উত্তরটা হল— সম্ভবত না।'

'আমি রিচার্ড ডকিন্স, রূপকথা নিয়ে আর কোনো কথাই বলতে চাই না।'

ডকিন্সের মা শৈশবে তাঁর ছেলের সঙ্গে সান্তা ক্লজের এক সাক্ষাতের কথা লিখে রেখে গেছেন— 'স্যাম বলে একজন ছিলেন, যিনি ফাদার খ্রিসমাস সেজে আসতেন। তিনি এলেই প্রচুর হৈ-হুল্লোড় হত। বাচ্চারা সবাই এতে দারুণ মজা পেত। তিনি চলে যেতেই আমি স্যাম চলে গেছে, বলে চেঁচাতে আরম্ভ করতাম। বড়দের তখন হতবুদ্ধিকর অবস্থা।' তাঁর ধর্মবিশ্বাস আরেকটু দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। 'আমার মনে হয় আট কি নয় বছর বয়স অবধি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলাম। ধর্মযাজকেরা বলত, যদি তুমি কোনো কিছুর জন্য একেবারে মন থেকে প্রার্থনা করো, তাহলে সেটা সত্যিই ঘটবে। আমি সত্যিই বিশ্বাস করতাম, প্রার্থনায় পাহাড়ও নড়ানো যায়। যখন বড় হলাম, এইসব শিশুসুলভ জিনিসও দূর হল।'

ডকিন্সের মতে, যে সব বাবা-মা সন্তানকে বড় করার সময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে বলছেন, তাঁরা শিশু নির্যাতনের অপরাধে অপরাধী, এরকম ভাবাটা 'বড্ড বাড়াবাড়ি' হয়ে যাবে। তবে যখন শিশুকে বলা হয়, সে যদি ঠিকঠাক না চলে তাহলে তাকে নরকের আগুনে সেদ্ধ হতে হবে, তখন সেটা শিশু নির্যাতনই হয়ে দাঁড়ায়।'

ভাষান্তর: পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪

২। প্রকাশকাল: ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রকঙ্গু বরুণ ভট্টাচার্য

৪। মুদ্রণস্থান: জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

৫। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০১৬ **বরুণ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক

সাধু সাবধান !

প্রিয় সম্পাদক, উৎস মানুষ,

মহাশয়,

আপনার দপ্তরে আমার এই পত্রাঘাতের বিশেষ কারণ হল আপনাদের সাবধান করা। গত কয়েকদিন আগে সান্ধ্য আড্ডায় হঠাৎ এক বন্ধু প্রশ্ন করে বসল, 'উৎস মানুষ পত্রিকাটা কি এখন আর বেরোয় ?' বলেই প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে গলা কাঁপিয়ে স্বর নামিয়ে বলল যে, 'অশোকদার প্রাণের প্রিয় ছিল এই উৎস মানুষ, পত্রিকাটাকে বাঁচানোর জন্য নিজের অসুস্থতাকে আমল না দিয়ে খাটা খাটুনি করে গেল লোকটা, অথচ অশোকদা চলে যাওয়ার পর পত্রিকাটা উঠেই গেল !' আমি হতভম্ব হয়ে ওর কথাগুলো শুনলাম। তারপর ওকে জানালাম যে, অশোকবাবু থাকাকালীনই ২০০৩ সালের পর থেকে পত্রিকা প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওঁর প্রয়াণের পর সেই ২০০৯ থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর উৎস মানুষ নিয়মিত বেরিয়ে চলেছে। গত কয়েক বছর ধরে আয়োজিত হচ্ছে 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'। কথাগুলো শোনার পর 'তাই নাকি !' বলে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বন্ধুবর কাজের অজুহাত দিয়ে উঠে গেলেন। আড্ডায় উপস্থিত অন্যান্যদের থেকে শুনলাম যে, সম্প্রতি গণবিজ্ঞান নিয়ে নাকি আবার কোথায় সভাটভা হয়েছে এবং সেখানে আলোচনা হয়েছে যে, গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পাশাপাশি উৎস মানুষ-কে পুনর্জীবিত করার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন সভার কর্মকর্তারা। তার মানে কাদম্বিনীর মতো উৎস মানুষকেও কি মরিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে সে মরে নাই ! আসলে উৎস মানুষ তার সীমিত ক্ষমতা ও সাধ্য নিয়ে পত্রিকাটা যে নিয়মিত বার করে চলেছে এটা বোধহয় অনেকেরই ভাল লাগছে না, কারণ কোনও নামীদামি গণবিজ্ঞান বিষয়ক লেখক বা বিশাল বিশাল ডিগ্রিধারী কাউকে পত্রিকার লোকেরা লেখা দেওয়ার জন্য সাধাসাধি করে না এবং কোনও পত্রিকাগোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করে মিথ্যা, অসম্মানজনক লেখাও ছাপায় না। এতটা ভদ্রতা বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত, তাই উৎস মানুষ উঠে গেছে প্রচার করে দিয়ে, অশোকের যথার্থ অনুগামী হিসাবে তারাই নব কলেবরে উৎস মানুষ বার করতে চায়।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝেছেন সাবধান করার কারণ কী ? একটা কথা না লিখে পারছি না, ৮০-র দশক থেকে গণবিজ্ঞান আন্দোলন শুরু হয়। শুরুর থেকেই আন্দোলনের বর্শামুখটা ছিল কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরোধিতা করার দিকে, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করার ওপরেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একেবারেই জোর দেওয়া হয় নি আন্দোলনের কর্মীদের মানসিকতাটাকে বিজ্ঞানমুখী করার দিকে। এই বিষয়টিকে অশোকবাবুও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি। তাই প্রথম থেকেই যেহেতু গণবিজ্ঞান আন্দোলন শুরু হয়েছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্যোগে, তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল, উচ্চ ডিগ্রিধারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ। গণবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে কোনও আলোচনাসভা মানেই বক্তা হন এইসব ব্যক্তিরাই। এঁরা কখনই সভার উদ্যোক্তা হতেন না। মাইক ভাড়া, হল ভাড়া, চেয়ার পাতা, মঞ্চসজ্জা এসবই ছিল আমাদের মতো তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীদের দায়িত্ব। সত্যি সত্যিই জনগণ কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারছে কি না এটা কখনই খোঁজ নেওয়া হয় নি।

আর তাই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের তিন দশক পরেও দলে দলে যুবক 'ভোলে বাবা পার করেগা'র দলে পা মেলায়; অনেক আধুনিকা মা গ্রহশান্তির জন্য ছেলেমেয়ের হাতে মুক্তো, গোমেদ ইত্যাদি আংটি পরান; স্বামীর সুস্থতার জন্য, মঙ্গলের জন্য তারকেশ্বরে, কালীঘাটে উপোস করে দণ্ডি কাটেন; গোমাংস রাখার অপরাধে মানুষ খুন করা হয়।

তাই, আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ গণমুখী যে কোনো লেখা নিয়ে উৎস মানুষকে বেরোতে দিন।

ইতি

জয়ন্ত বিশ্বাস

কোচবিহার

সনাতনের তৃতীয় কাহিনী সম্পর্কে দু-চার কথা

'উৎস মানুষে'র জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় সনাতনের তৃতীয় কাহিনীঘ্ন জ্যোতিষ শীর্ষক লেখাটি পড়ে কয়েকটি কথা প্রশ্ন মনে জাগল। কাহিনীর শুরুতেই স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তার মানে কি বিবেকানন্দ হলেই সব ঠিক বলবেন ? লেখকের মতে যদি একথা সত্য হয়, আমার মতে অন্ধবিশ্বাস। এই অন্ধবিশ্বাসেরই তো সমালোচনা করা হয়েছে এই কাহিনীতে। যদিও আমি স্বামীজির এই বাণী ঠিক নয় একথা বলছি না। আবার দেখুন, বিজ্ঞানমনস্ক লেখক অধ্যাত্মবাদের সমালোচনা করার নিমিত্তই এই রূপক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কিন্তু লেখার শুরুতেই বিবেকানন্দের বাণী দিয়েছেন! যে বিবেকানন্দ অধ্যাত্মবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা। এটা দ্বিচারিতা হচ্ছে না কি? অধ্যাত্মবাদ নিখাদ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান যুক্তির ওপর নির্ভরশীল। আগে সাধারণ মানুষ মনে করতেন, পৃথিবীটা সমতল ও গোলাকার। বিজ্ঞানীরা যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ দিলেন পৃথিবীর বলের মতো। ধর্মের মতো বিজ্ঞান চরম সত্য বলে কিছু মানে না। একসময় প্লুটো যত বড় বলে বিশ্বাস ছিল, এখন তা বদলেছে। যার জন্য একে বামন গ্রহ বলা হচ্ছে। ঈশ্বরকণা প্রতিষ্ঠিত হলে বিজ্ঞানের অনেক ধারণাই বদলে যাবে।

আমার ধারণা, মানুষ যেদিন বনে প্রথম দাবানল দেখে ভয় পেয়েছিল, সেদিনই রোপিত হয়েছে ধর্মের বীজ। আর যেদিন মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল এবং তাকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিল, সেই দিনই মানুষ বিজ্ঞানকে সঙ্গী করেছিল নিজের চলার পথে। ধর্ম আর বিজ্ঞান এই দুই বিদ্যাই ছিল সভ্যতার পথে এগিয়ে চলার দুই সহায়। বিজ্ঞান মানুষকে চলার পথ দেখিয়েছে। ধর্ম মানুষকে সামাজিকতা শিখিয়েছে। আসলে ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই বিদ্যাই 'শুদ্ধ', কিন্তু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এবং অপবিজ্ঞান মানুষকে সর্বদাই পিছনপানে টানছে। অনেক তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেইটিকেই আসল বলে চালানোর চেষ্টা করেছে কিছু দুষ্টু লোক। যেমন মানুষের কর্মদক্ষতার নিরিখে মানবসমাজকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। পরবর্তীকালে এই সামাজিক বিভাগকে বংশানুক্রমে ভোগের তকমা দেওয়া হয়; আবার দেখুন বৈজ্ঞানিকরা বহু বছর পরিশ্রম করে পরমাণু শক্তির আবিষ্কার করলেন। কিছু দুষ্টু লোক সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বোমা তৈরি করল যা আমাদের প্রিয় এই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। এখানেও বিজ্ঞানকে দায়ী করা যায় না। একে বলে অপবিজ্ঞান। বিভিন্ন সাধু বা গুরুকে দেখা যায় নানান ভেল্কি দেখিয়ে নিজের গরিমা জাহির করেন এবং ভক্তদের অন্ধবিশ্বাস অর্জন করেন। এই ভেল্কির পিছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড। এখানে দেখুন অন্ধবিশ্বাস ও অপবিজ্ঞান হাতে হাত মিলিয়ে মানুষকে ঠকাচ্ছে।

প্রাচীনকালে জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের অংশ ছিল। বিজ্ঞানে উন্নতির ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফেলে দেওয়া অংশই হল জ্যোতিষশাস্ত্র যা ভাঙ্গিয়ে লোক ঠকাচ্ছে জ্যোতিষীরা। আমার মতে, দায়ী তারাই, যারা বিজ্ঞান ও ধর্মকে বিকৃত করে কার্যসিদ্ধি করছে।

সবশেষে এইটুকু বলা যায় কালে কালে যে সব মনীষী ধর্মসংস্কার বা বিজ্ঞানচর্চা করে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা সকলেই কিন্তু মানবসমাজের উন্নতির জন্য কাজ করেন নি বরং কিছু মনীষী মানবসমাজের ক্ষতিও করে গেছেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক বা ধর্মীয় সংস্কার বা কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করার সময় আমাদের ভাবা উচিত এই সংস্কার কালের প্রয়োজনে তৈরি হয়। যেমন শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় খৈ ছড়ানো হয়। কিন্তু কেন? মাটিতে পড়ে থাকা খৈ পিছিয়ে পড়া লোকেদের পথনির্দেশিকা। যেহেতু খৈ সাদা, অন্ধকারেও তা দেখা যায়। মনে রাখতে হবে যে সময়ে এই সংস্কারটি তৈরি করা হয় তখন বৈদ্যুতিক আলোর জন্ম হয় নি। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সংস্কারটি তৎকালীন যুগের উপযোগী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা অপ্রয়োজনীয় এবং কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। তাই বলা যায় বিজ্ঞান এবং ধর্ম মানুষকে উন্নতির শিখরে উঠতে সাহায্য করে চলেছে নিরন্তর। অপরদিকে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার মানুষের শিখরপানে চলার পথে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অঞ্জন ঘোষ, বালী

পুস্তক পর্যালোচনা

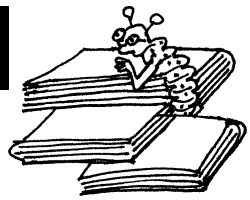

ছোট তবে বারুদে ঠাসা

বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা (Science and Atheism) জানুয়ারি ২০১৬ (সপ্তদশ সংখ্যা)
অনুদানঙ্ক ১০ টাকা, সম্পাদক: ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

মাত্র ১৬ পাতার চটি পত্রিকা। যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু। প্রথমেই চোখ টানে প্রচ্ছদ। সেখানে আঁকা হয়েছে কার্টুন। তাতে দেখা যাচ্ছে– দুই সম্প্রদায়ের মৌলবাদী পাঞ্জা লড়ছে, চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে আম আদমি। নীচে ক্যাপশন– 'হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদী ভাই ভাই।' এরই রেশ ধরে নানান গুরুত্বপূর্ণ লেখা। যেমন একটি লেখা হল– 'অবিজ্ঞানের দাসত্ব করে দাঙ্গা বাধানো যায়, দেশ ও মানুষ গড়া যায় না'। এতে রয়েছে, 'মহাভারতে বলা হয়েছে কর্ণ তাঁর মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেন নি। এর অর্থ যখন ঐ মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে, তখন জেনেটিক সায়েন্স ভালভাবেই বিকশিত হয়েছিল। আমরা সবাই গণেশজির পূজো করি। অবশ্যই ঐ সময় কোনো প্লাস্টিক সার্জেন ছিলেন, যিনি হাতির মাথা এক মানুষের শরীরে জুড়ে দিয়েছিলেন। একথাগুলি দেশের প্রধানমন্ত্রী একটি হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গিয়ে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন।' আরও আছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জনৈক দিননাথ কাটরার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি বর্তমানে গুজরাটের ৪২ হাজার স্কুলে পড়ানো হয়। বইতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তায় কর্ণ ও গণেশ নিয়ে যা লেখা ছিল, তা এই আলোচনার গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল– 'জ্যোতিষ ও ভাগ্যফলের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ', 'মুক্তমনা ব্যক্তিত্ব পেরিয়ার'; 'হায় আল্লা! ওহ্ গড! হে ভগবান!' সংবিধানের ৫১এ (এইচ)-এর উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে এই কারণে যে, তাতে বলা আছে 'প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার গড়ে তোলা' (fundamental of every citizen is to develop a scientific temper, humanism and the spirit of enquiry and reform)। আর আমরা কী দেখছি? নরেন্দ্র দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারে, কালবুর্গির মতো মুক্তচিন্তার মানুষদের খুন করা হল। ছাত্রদের ওপর মৌলবাদীদের হামলা হুঙ্কার তো সমানে বাড়ছে। মুক্তচিন্তার পায়ে শেকল পরিয়ে দেবার কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। 'বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা'-র প্রকাশককে জেলে পুরে দেবার কথা যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তা কিন্তু একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এ পত্রিকার যত প্রচার বাড়ে ততই ভাল। কেননা তালিবানি চাবুক পিঠে পড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা!

বরুণ ভট্টাচার্য

'অন্ধকার দিয়ে অন্ধকার দূর করা যায় না; একমাত্র আলোই পারে সে কাজ করতে'
'Darkness cannot out darkness, only light can do that'
- Martin Luthar King, Jr.

সংগঠন সংবাদ

শহর কলকাতায় জমজমাট জাদুমেলা

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ম্যাজিক অ্যাসোসিয়েটস (FIMA) আয়োজিত ম্যাজিক মেলা ৯-১৩ মার্চ ২০১৬ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে হয়ে গেল। ফিমা জাদুকরদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই মেলার আয়োজন করছে। মেলার প্রবেশপথ মাকড়সার জালের আদলে। মেলা প্রাঙ্গণে একটা বড় মঞ্চ ছিল। আর মাঠের ধারে ধারে ছড়িয়ে ছিল ছোট মুক্ত মঞ্চ। মানে একটা টেবিল আর সামনে খানকয়েক চেয়ার। এখানে জাদুকররা দেখাচ্ছিলেন ক্লোজ-আপ ম্যাজিক। ছিল বেশ কয়েকটা স্টলও। যেখানে বিক্রি হয়েছে জাদু-সরঞ্জাম, জাদু সংক্রান্ত বইপত্র। জাদুকর শৈলেশ্বরের সংগ্রহ থেকে ছবি নিয়ে সাজানো হয়েছিল একটি গ্যালারিও। দূর দূরান্ত থেকে জাদুকররা মঞ্চের সামনে খোলা জায়গায় যে যার মতো খেলা দেখালেন। হাতসাফাই, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে জাগলিং, ভোজবাজি, মাদারি-কা-খেল, চেন দিয়ে দু'হাতে তালা দিয়ে দেওয়া হল, জাদুকর নিমেষের মধ্যে সেই তালা খুলে হাত তুলে দেখালেন। প্রবল হাততালি। এসব দেখে ছোটরা আনন্দে আত্মহারা। বড়রা যেন নিজেদের ছোটবেলাটা ফিরে পাচ্ছিল। মাদারি-কা খেল এককথায় অবিশ্বাস্য। ছোট্ট জালের মধ্যে বছর আটেকের ছেলেটিকে পুরে বেশ কষে বেঁধে দেওয়া হল, ওভাবেই একটা ছোট তাঁবুর ভেতর (যার চাল খোলা) জালসুদ্ধ ঢুকিয়ে দিয়ে মাথায় একটা পাতলা চাদর দিয়ে ঢাকা দিয়ে জাদুকর এক হাতে ডুগডুগি, ঠোঁটে বাঁশি নিয়ে বাজাতে বাজাতে অনায়াসে ছেলেটিকে ভ্যানিশ করে দিল। পুরোটাই কিন্তু খোলা মাঠে চারপাশে দর্শকের মধ্যে দেখানো হল। নামীদামি জাদুকররা এই খেলাটাই দেখান চারপাশে ঘেরা মঞ্চে। কতটা অনুশীলন করলে খোলা জায়গায় চারপাশে দর্শকদের নিয়ে এই খেলা দেখানো যায় তা আমাদের ধারণার বাইরে। এই জাদুকররা সবাই ফিমার সদস্য। প্রায়ই শোনা যায়, বাবা-মা অবাধ্য সন্তানদের মনোবিদের কাছে নিয়ে যান। আসলে ছোটদের জগৎ থেকে নির্মল আনন্দটাই উবে গেছে। ম্যাজিক নেই, বিকেলে খোলা মাঠে খেলা নেই, পুকুরে সাঁতার নেই, বাড়িতে দাদু-দিদার আদর নেই, পিসি নেই, মাসি নেই, পাড়াপড়শির আদর নেই, বকুনি - না থাক বাবা- এদের জীবন থেকে শৈশবটাই হারিয়ে গেছে। FIMA-কে ধন্যবাদ। ম্যাজিকের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবার জরুরি কাজটা তারাই করছে। সমাজে সুস্থ সংস্কৃতি তো আকাশ থেকে টুপ করে পড়বে না, তার জন্য চাই যোগ্য সংগঠক আর সংগঠন চাই। আর চাই FIMA। ওদের ঠিকানা: FIMA, 202 SDF BUILDING, SECTOR V, SALT LAKE, KOLKATA- 91 (Ph.033-23576414/6415), email - contact@fima.org.in